নিহত নক্ষত্র

[প্রথম প্রকাশ ১৯৬৯]

উৎসর্গ

অধ্যাপক শাহেদ আলী
শ্রদ্ধাভাজনেষু
মুহম্মদ ওহিদউল্লাহ
অগ্রজ প্রতিমেষু

নিহত নক্ষত্র

১

হলে থাকার সময়ে মুনতাসীরের সঙ্গে পরিচয়। সে আমার রুমমেট ছিল।

ছিপছিপে চেহারার ফর্সাপনা সুন্দর মুখের যুবক। মনে হত কিশোর। সবে দাড়ি গোঁফ কামাতে শুরু করেছে। মুখমণ্ডলে ছড়ানো অমল প্রভা। চশমা পরত মোটা ফ্রেমের। গ্লাসের নিচে দেখা যেত এক জোড়া কালো দাগ। তখন তার বয়েস মনে হত অনেক বেশি। কালো দাগ দুটির জন্য মুনতাসীর আমার বন্ধু হতে পারেনি। ও দুটি যেন হাড়ে হাড়ে কাঁপন জাগানো একান্ত অন্বিষ্ট চিন্তার দুটি কৃষ্ণ ফলক।

নিজের কথা বলি। আমি পূর্ব বাঙলার অরাজক যুগের যুবক। চটুল আমার স্বভাব। গাম্ভীর্যকে ভয় করি, সহজ হওয়া আমার পক্ষে আত্মহত্যা করার চাইতেও অসম্ভব। অন্য কোথাও সুযোগ না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলাতে ভর্তি হয়েছি। বলতে আমার সঙ্কোচ নেই। বিভাগীয় বন্ধুদের শতকরা নব্বইজনের অবস্থাও আমার মত।

মুনতাসীরের কথা একটু আলাদা। এইচএসসি-তে সে যশোর বোর্ডে থার্ড হয়েছিল। ইলেভেনথ ক্লাসে সায়েন্স পড়ত। ফোর্থ প্লেস পাওয়ার পরেও কেন এল পুরোনো কবিদের অস্থি ঘাঁটতে, সে আমি বলতে পারব না। আমরা মনে করতাম, কঠিন নীরবতা আর চোখ ধাঁধানো রেজাল্ট নিয়ে বাঙলাতে ভর্তি হওয়ার পেছনে, আমাদেরকে ব্যঙ্গ করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বরাবর চুপচাপ থাকত সে। রেশমের মত কোমল ছিল কণ্ঠস্বর। রিন রিন করে বেজে যেত কানের পর্দায়।

আমাদের খালেদ বলত, মুনতাসীর একটা 'হমবগ'। আমরা মনে করতাম, হয়ত হবে। ও আমাদের হয়ে মতামত দিত। আমরা চোখ বুজে মেনে নিতাম। তাছাড়া উপায় ছিল না। সবগুলো দৈনিক আর মাসিকে ওর নানারকম লেখা ছাপা হত। ওকে ঠেস দিয়ে কোন রকমে সংবাদপত্রের সাহিত্যের পাতায় নিজেদের নামগুলো ছেপে নেওয়ার লোভে জিভ দিয়ে টসটসিয়ে জল ঝরত। সেও জানত। ওর চেলাগিরিতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অলিখিত চুক্তি অনুসারে আমাদের ছোট দলটিতে নিত্য নতুন কর্তালী ফলিয়ে আসন অটুট রাখত।

আমরা তখন জীবনানন্দ দাশের ‘বনলতা সেনে’র জগতের শৌখিন পরিব্রাজক। কোন বিশেষ মহিলাতে ‘পাখির নীড়ের মত চোখে’র বিস্ময়কর আবিষ্কারে রাত কাটাচ্ছি নির্ঘুম। সিঁথির টিকলীর মত আকাশের বুকে ঝুলে থাকা ঠাণ্ডা চাঁদের আলোতে মনের অত্যন্ত নিভৃতের গহন গভীর আকাঙ্ক্ষার সোনার জলে লেখা অরুণ বরুণ বেদনার পাঁচালী পাঠ করে আশরীর কম্পান্বিত হচ্ছি। ঝড়ের পূর্বের আকাশ যেমন, তেমনি বেদনায় ফার্নেসের মত লালিয়ে উঠত বুক। প্রকাশের তীব্রতম বেদনায় কেঁদে উঠতাম। বুকের কান্না গলার কাছে আটকে যেত। অরাজক যুগ কালো হাতের কুশ্রী মোটা আঙুল বাড়িয়ে চেপে ধরত কণ্ঠনালী। জীবনের অন্য দশটা উপেক্ষিত কর্তব্যের মত বুকের সৃষ্টিশীলা ক্রন্দনকেও আমরা অপমান করতাম। মনের থলিতে ব্যথা জমে হীরকের মত ভারি কঠিন হয়ে উঠতে পারত না। শুষে নিত অরাজক যুগ, রকমারী হুজুগের উত্তপ্ত রসনায়। আমাদেরকে ঘিরে হু হু করত শূন্যতাবোধ। বাতাসের বিশাল সমুদ্দুরে আমরা সব শোলার পুতুলের মত ভাসতাম। শূন্যতাবোধের পীড়নে চিৎকার করতাম প্রাণপণে।

পুরোনো কবিতার রসে নাকানি চুবানি খেয়ে খেয়ে, পুঁথিসাহিত্যের মরা ঘেঁটে ঘেঁটে, ইসলামি আদর্শের মৃতবৎসা গাভীকে মাথায় করে বয়ে রয়ে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা অন্বেষণের মৃগয়া করে করে, অধ্যাপকবৃন্দের মুখস্থ করা ভোঁতা লেকচারের নোট লিখে লিখে, আমরা সকলে এক ছাঁচের, এক মাপের হয়ে পড়েছিলাম। কেউ যদি বলে হুক্কা, কেউ বলতুম হুয়া।

মুনতাসীরের কথা বলি। বন্ধু না হোক, না হোক সমমর্মী, তবু রুমমেট তো! একই সঙ্গে, একই ছাদের তলায় অষ্টপ্রহর কাটাই। ধীরস্থির যুবকের মুখে ছড়ানো সারল্যের গোলাপী সুষমা। এখনো মনে হয় নওল কিশোর। একদিন ঘুমন্ত মুনতাসীরকে দেখে অপরূপ ভাব জেগেছিল আমার মনে। বালিশের শুভ্র চত্বরে অনতিদীর্ঘ নরম চুল এলোমেলো ছড়ানো। অষ্টমীর আধো ভরাট চাঁদের আলো জানালা গলিয়ে এসে লেগেছে মুখে। ফর্সা গৌরবরণ মুখে ঢেউ খেলছে, ওকী? সৌন্দর্য না সারল্য? কেন জানিনে, আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল ‘নবীন অঙ্গের লাবণী ঢল ঢল বহিয়া যায় গো।’

ঘুমিয়ে আছে মুনতাসীর। যেন ইরান বোস্তানের পরী রাজকুমার। নিশ্বাসের তোড়ে তোড়ে পাতলা ঠোঁট দুখানি অল্প অল্প কাঁপছে। সেদিনের অনির্বচনীয় উপলব্ধির উত্তাপে খালেদের দেওয়া ধারণাটা পুড়ে গেল। ও যেন অনেক দূরের মানুষ। সারা জীবন হেঁটেও তার নাগাল পাব না। দার্জিলিং থেকে দর্শনার্থীরা যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘার চুড়োর সৌন্দর্য দেখে, তেমনি মাঝে মাঝে আমিও মুনতাসীরকে দেখতাম। আর অবাক হতাম।

মুনতাসীর ক্লাসে যেত, উৎকর্ণ হয়ে অধ্যাপকের লেকচার শুনত। যেত লাইব্রেরিতে, রেফারেন্স বই খুলে ঝুঁকে পড়ে নোট নিত। আমরা ক্যান্টিনে বসে

দেখতাম। মাঝে মাঝে আসমানের বুকে মাথা তোলা, রেডিও বন্ড কাগজের মত অকলঙ্ক সাদা বল্কলে আবৃত কাণ্ড, ডালপালা ছড়ানো ইউক্যালিপট্যাস গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে রুমালে চশমার কাচ ঘষতে ঘষতে তহুরার সঙ্গে কথা বলছে। আর দেখতুম তহুরার জমাট বাঁধা স্তব্ধতার দর্পণের মত মুখে আলোময় কি একটা জ্বলছে। নারকোল কুঞ্জ ঘেরা দুটি শান্ত সরোবরের মত চোখে আনন্দের ঢেউ কাঁপছে থরথর।

তহুরার কথা বলি। সে আসত মতিঝিলের দিক থেকে। টাউন সার্ভিসে চড়ে। কোন কোন দিন আসত রিকশা চেপে শ্যামলা মত মেয়েটি। পরনে সাদা শাড়ি। গোড়ালির কাছে জেগে থাকত নীল সায়ার আভাস। চুলের বিনুনি একটানে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া কালো জলের ধারার মত নেমে এসেছে কোমর অবধি। সেখানে ঝুলত একটি ফিতে। হলুদ কিংবা লাল। আসত নীরবে। থাকত নিভৃতে। কেমন করে দৃষ্টির অতীত হয়ে যেত। এক ঝাঁক কলকলানো হাসি ছুঁড়ে মারা, তেরছা দৃষ্টির কসরত করা মেয়েদের ঝাঁক থেকে হঠাৎ কোথাও উধাও হয়ে যেত। আর আর মেয়েরা ময়ূরের মত পেখম মেলত। কপট রাগে নকল মুখে লাল লাল রং ফলাবার চেষ্টা করত। কপট হাসিতে ননীর পুতুলের মত গলে যাবার ভান করত। ছেলেদের হ্যাংলামো আর মেয়েদের ন্যাকামোর বিরুদ্ধে তহুরা যেন একখণ্ড রক্ত মাংসের নিথর প্রতিবাদ। সিঁড়ি বেয়ে নিস্তব্ধ ছায়াময়ী জীবন্ত একটি রজনীগন্ধার ঝাড়ের মত দোতলা তেতলায় উঠত। জুতোতে শব্দ হত না। অন্যান্য মেয়েদের চাইতে ভিন্নতর প্রকৃতির তহুরা নিজের সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন অথবা মোটেই সচেতন নয়। চোখের শান্ত দৃষ্টি কোটরের কৃষ্ণ গভীর তামস বলয়ে খাঁচার পাখির মত স্থির হয়ে থাকত। এ তহুরাই একদিন গোটা ক্লাসের সামনে অসাধারণ হয়ে দেখা দিল। হাসনাত সাহেবের মত বদরাগী পার্সেন্টেজ কাটা অধ্যাপককে অসম্মানজনক মন্তব্যের জন্য ধমকে দিল। সাহসিকার দিকে আমরা সদ্য সদ্য চোখ মেলে তাকালাম। আমি দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাদের খালেদ গলতে শুরু করেছে। বিশেষত্বময়ী নারীদের প্রতি খালেদের মিষ্টি দুর্বলতার খবর বিলক্ষণ আমি জানি। মেয়েদের মন ভোলানো সূক্ষ্ম কৌশলগুলো একে একে প্রয়োগ করে চুপ মেরে গেল। ইতোমধ্যে তহুরার স্তব্ধ দৃষ্টি মুনতাসীরের পানে আলোময় রেখায় নাচতে লেগেছে। মুনতাসীরকে দেখে সে চারাগাছে বাতাস লাগার মতই কাঁপত। সে কাঁপুনি এতই অকৃত্রিম যে প্রাণপণ সংযমেও শরীরের কোথাও, কোন গহন গোপন অন্তঃপুরে লুকিয়ে রাখতে পারত না। মুনতাসীরকে দেখা মাত্রই গাম্ভীর্যের শিলাঞ্চল ফেটে সারা শরীরময় আলো চিকচিক রাঙা জলের গীতিময়ধারা বয়ে যেত।

আমাদের খালেদ মন্তব্য করল 'তহুরার মোটাসোটা শরীরের ওপর দিয়ে বয়সের অনেক জল গড়িয়ে গেছে হে। সেজন্যই তো মুনতাসীরের মত

একখানা ভাল রেজাল্টের যন্ত্রকে বেছে নিল।' আমার বন্ধুরা সায় দিল খালেদের সঙ্গে। সকলে বলল তা তো বটেই, তা তো বটেই, শরীরের মেদ লাগছে কিনা, তাই হাতের কাছে যাকে পেল গেঁথে নিল। আমি চুপচাপ থাকলাম।

নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে এক পাও ফেলে না মুনতাসীর। ক্লাস, লাইব্রেরি, ডাইনিং রুম, ক্যান্টিন। কখনো কখনো ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় কিছুক্ষণ। সব সময় রুমের মধ্যে বসে পড়ত, লিখত। আর গালে হাত দিয়ে ভাবত। চশমা জোড়া খুলে দুটি টানা টানা চোখের বালবের মত দৃষ্টি দিগন্তের দিকে বাড়িয়ে ধরত। কী দেখত, সেই জানে। তখন তার গালজোড়াতে বিকেলের লালিমা ছায়া ফেলত। মনে হত, ঐ দূরের শিমুল গাছটির শিয়রের উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের মত প্রতিভা এলানো নক্ষত্রটির প্রেমে পড়েছে। ও অবস্থায় তাকে দেখলে আমার বুকটা কেঁপে যেত। জান্তব প্রবৃত্তিগুলো নিজের অজান্তে কোমল হয়ে তার দিকে হেলছিল। কেন বলতে পারব না। হয়ত সৌন্দর্য আর সৌকুমার্য মনের ওপর কোমল পরশ দিচ্ছিল।

দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির আকাঙ্ক্ষার মুকুল আমরা। একেক জন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী দশ দশটি হাজার দেশবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছি। ফুরসত ছিল না আমাদের। তরুণ কণ্ঠের আগুনমাখা স্লোগানের রসে খাটে শোয়া ইতিহাসের লাশ পিট পিট করে চোখ মেলছেন। এই বুঝি তিনি জাগলেন। এই বুঝি সমস্ত দেশের আনাচে কানাচে একটা মস্ত সাড়া পড়ে গেল। বঞ্চিত লাঞ্ছিত আর নিপীড়িতের বুকের ব্যথা এঞ্জিন হয়ে হেঁচড়ে টানে প্রগতির দেবে যাওয়া চাকাগুলো উঠিয়ে ভন ভন বেগে এই বুঝি চলতে আরম্ভ করল।

কল্পনা করতাম, মাঠে সোনার ধান, চাষার মুখে গান, বুকে স্বপ্ন। কলকারখানাতে শ্রমিকেরা হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে গড়ছে ভবিষ্যৎ। কবিরা ছড়িয়ে দিচ্ছেন ছন্দে, গানে, উপমায়, প্রতীকে রাশি রাশি আবিরের মত সূর্যসঙ্কাশ কল্পনা। এমনি একটা নয়নশোভন ছবি কল্পনা করে আনন্দে রাঙা হয়ে যেতাম। উদ্দীপনায় চাঙ্গিয়ে তুলত সমস্ত অন্তরাত্মা। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে দেখতাম, ইতিহাসের লাশ তেমনি নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছেন। যুগযুগান্তরে কোনদিন বুঝি ভাঙবে না ঘুম। বড় দমে যেতুম। নেতাদের কেউ ঘুম জাগানিয়া সোনার কাঠির সন্ধান পাননি। বাহারি বুলি, জেল্লাদার বক্তৃতার লোভ ছাড়িয়ে, শহরের সীমানা পেরিয়ে, গায়ে কাদা মেখে, কাদার মত মানুষদের বুকে অগ্নিমন্ত্র দেবার মত হৃদয়বান দুঃসাহী যুগমানব কই?

তাই বলে আমাদের উৎসাহের ঘাটতি ছিল না। যাকে তাকে ঠগবাজ, চোরা কারবারি, বীমার দালাল, ধর্মবেপারি, মুরিদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা ভণ্ড পির, সকলকেই ঠাওরাতাম নেতা! কেউ গরম গরম কথা বললে মনে করভাম, এই তো তিনি এলেন, যার জন্য গোটা দেশ রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষায় বসে আছে। এবার জীবন মর্যাদার আসনে বসবে। সপ্রাণ আঘাতে জরা, মরা, শোষণের

শৃঙ্খল ছিন্ন করবে জীবন। চেঁচিয়ে স্লোগান দিতাম। ডাকতাম বড় সভা। ডাকসাইটে বক্তাদের ধরে নিয়ে আসতুম। দলবেঁধে সংস্কৃতি পাহারা দিতাম। রবীন্দ্র জয়ন্তী করে রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদের কল্পস্বর্গে তুলে দিতাম। আরো করতাম কত কিছু, জাতীয় আন্তর্জাতিক। ব্যক্তিগতও ছিল কিছু কিছু। যেমন হৃদয়ে আঘাত অপঘাত, চোরা ঘা পচা ঘা ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেসব কথা নাই বা বললাম।

মুনতাসীরকে আমাদের কোন কিছু স্পর্শ করত না। সে বাস করত একখানা স্বপ্নের আবেষ্টনীতে। মুরগির মত শরীরের সমস্ত উত্তাপ কেন্দ্রীভূত করে স্বপ্নের স্বর্ণডিম্বের বাচ্চা ফুটাবার সাধনা করত বুঝি। বন্ধুরা বিদ্রূপ করত। আড়ালে হাসাহাসি করত। কিছুই মাখত না গায়ে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে দু ঠোঁট ফাঁক করে হাসত। ঠিক হাসত না। হেসে ওঠার চেষ্টা করত। তখনই চোখের পাতার নিচে কালো ফলক দুটি দীপ্তিমান হয়ে উঠত।

স্লোগান দিয়ে ক্লান্ত হয়ে সাহিত্য করার চেষ্টা করতাম। সে ভয়াবহ কাপালিক প্রচেষ্টার কথা মনে হলে হাসি পায় এখন। পদ্মার জাগা নতুন চর দখলের অসহিষ্ণু লেঠেলের মত 'আলি আলি' হুঙ্কার ছেড়ে আসরে এসে নামতাম। প্রচণ্ড ধূলি ওড়াতাম। পায়ের তলার কাদাকে আকাশে ছুঁড়ে দিতাম।

দেশে কাগজ নেই। দুয়েকখানা দৈনিক যা আছে, সেগুলোর সাহিত্য-সম্পাদক নামধেয় ব্যক্তিদের রস জ্ঞান দেখে আমাদের বমি আসতে চাইত। দুয়েকখানা মাসিক সাপ্তাহিকও ছিল। তার কোনটাতে ঠেসে ছাপানো হত ওয়ার্কস প্রোগ্রামের খবর। আর কোনটাতে ছাপানো হত সম্পাদকের মোসাহেবদের লেখা। আমরা ওভাবে মাথা হেঁট করব কেন? তরুণ মনের ব্যথা মনের ভেতর তাজা কয়লার আগুনের নাহান ধিকি ধিকি জ্বলত। সে জ্বলুনি দিয়ে মেয়ে মানুষকে ভালবাসতাম। তারা আমাদেরকে মিষ্টি মিষ্টি মধুর মধুর সব ফাঁকি দিত। অধ্যাপকেরা চোখ রাঙাতেন, প্রবীণেরা দূর দূর করতেন। কখনো সখনো এক আধখানা সংকলন প্রকাশ করে আমাদের সমস্ত ক্ষোভ ঢেলে দিতাম। অশ্লীল ভাষা ধার করে গল্প কবিতা লিখে সাহিত্যের অফিসারদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতুম। তাঁরা চটে লাল হতেন। আমাদের মজা লাগত। অরাজক যুগের নিষ্প্রাণ বাতাসে ঘুষি বাগিয়ে বীরত্বের আস্ফালন করতাম। ভাসাভাসাভাবে একে অপরের প্রশংসা করতাম। পিঠ চুলকে দিতাম। কিন্তু মনের গভীরে একে অন্যকে করতাম তীব্রভাবে ঘৃণা।

একবার আমাদের খালেদ একটা গল্প লিখে বসল। খুব ঝাঁঝালো কড়া গল্প। বস্তুবাদী লেখক হিসেবে খালেদের পরিচিতি আছে। একজন জাঁদরেল সম্পাদক পর্যন্ত ওর পারঙ্গমতায় একেবারে যাকে বলে পঞ্চমুখ। এবার আমাদের দ্বিমাসিক সংকলন 'ঋতুরঙ্গে' একখানা তেজালো গল্প লিখে একেবারে মাত করে দিল। চার চারটি কাগজে সমালোচনা বেরিয়েছে। দুজন জায়গায় জায়গায়

একটু খুঁত নির্দেশ করেও ভাল বলেছেন। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা মিলিয়ে তার কাছে চিঠি এসেছে এক ডজন আর দুখানা। গল্পটা নিয়ে আমরা ঝড় তুললাম আলোচনার। রাতারাতি খালেদকে বীরের আসনে বসিয়ে দিলাম বলতে গেলে।

মুনতাসীর থাকে তার নিজের জগতে। আমাদের কোনকিছুর খবর রাখে না। আন্তরিক প্রীতিবশত গল্পটি তাকে পড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আমি। গ্রন্থের জগতে আত্মগোপনকারী এ লোকটিকে কতবার শিল্প-সাহিত্য আর বাদ প্রতিবাদের জগতে টান দিয়ে নামিয়ে আনতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু বলতে পারিনি। নিজের মধ্যে কোথায় একটা আড়ষ্টতা অনুভব করে থেমে গেছি। কোথায় যেন মুনতাসীর নিষেধের কুণ্ডলী রচনা করে রেখেছে নিজের চারদিকে। অদৃশ্য কুণ্ডলী। আজকে কিন্তু স্থির থাকতে পারলাম না। ডাক দিলাম

'মুনতাসীর।' বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল। 'ঋতুরঙ্গের' কপিখানা তার হাতে দিয়ে বললাম : পড়ে দেখ কী আশ্চর্য গল্প লিখেছে খালেদ। সমালোচকদের মতে এটি পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলোর একটি।

হাত বাড়িয়ে কপিটা নিল। নাকের ডগায় আলগোছে চশমা জোড়া চড়িয়ে পড়তে বসল। কি বলে, শোনার জন্য আমি কক্ষময় অধৈর্য হয়ে পায়চারি করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে পড়ছে মুনতাসীর। চিকন আঙুল দিয়ে খসখস করে পাতা ওল্টোচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে বিকিরিত হচ্ছে, এক ঝলক হাসি। আবার জাগছে ললাটে বিরক্তির কুঞ্জন রেখা। হ্যাঁ, বোধক মাথা নাড়ছে। আবার চুক চুক করে আফসোস করছে। বিরক্ত হয়ে গেলুম। প্রায় বিশ মিনিট পরে কপিটা ফেরত দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম :

'কেমন লাগল?'

'লাগল এরকম।' নিস্পৃহ জবাব।

'সমালোচকেরা যে শ্রেষ্ঠ গল্প বলেছেন।' সংযম রাখতে পারলাম না।

'বলুন না, তাতে কি হল। শ্রেষ্ঠ আর বিখ্যাত অ্যাখ্যা দেওয়া তো পেশাদার মামুলি সমালোচকদের একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

আমার মনে একটা সন্দেহ জাগল। হয়ত মুনতাসীর ভাল ছাত্র বলে মনের কথা প্রকাশ করছে না। অনেক লেখাপড়ায় ভাল ছাত্র দেখেছি। চাবুক মারলেও তারা এক কলম লিখতে পারে না। কেরদানি দেখিয়ে মুখ রক্ষা করে। মুনতাসীরও কি তেমন করছে?

কী একটা ইংরেজি গানের কলি হেঁড়ে গলায় গাইতে গাইতে খালেদ আমাদের রুমে এসে ঢুকল। কোত্থেকে কি হয়ে যায়, এই ভয়ে আমি আলোচনা ধামাচাপা দিতে চেষ্টা করলাম।

মিছিল কিংবা সাহিত্য সভার দিকে মোড় ঘুরিয়ে দেবার অজুহাত অনুসন্ধান করছিলাম। কথা কয়ে উঠল মুনতাসীর।

'এই যে খালেদ সাহেব, আপনার গল্পটি পড়লাম।'

'তাই নাকি?' খালেদের কণ্ঠে বিদ্রূপের আভাস। তার অর্থ তুমি পড়লেও কি, না পড়লেও কি, যাদের জন্য লিখেছি, ওরা তো পড়েছে। পড়ে প্রশংসা করেছে। তবু লেখকের দুর্বলতাবশত জানতে চাইল।

'কেমন লাগল?'

'সে কথাই তো বলছিলাম এতক্ষণ।'

'কী?'

'জাফর বলছিল : অনেকেই নাকি গল্পটির প্রশংসা করেছে। আমার ধারণা গল্পটি তত ভাল হয়নি। আপনি তো লেখক। আশা করি আমার সঙ্গে একমত হবেন।'

চট করে খালেদের মুখভাব পাল্টে গেল। যথাসম্ভব ক্ষোভ দমন করে বলল :

'দোষগুলো কী কী বলুন দেখি দয়া করে।'

'গল্পটা অত্যন্ত কাঁচা আবেগ দিয়ে লিখেছেন। কুলিরা ক্ষেপে গিয়ে বিশ্বাসঘাতক বেচারা ফোরম্যানকে জ্বলন্ত বয়লারের মধ্যে ফেলে দিল, আমার মনে হয়েছে, তাতে আপনাকে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। কাহিনীর গাঁথুনির মধ্যে পরিণতির যথার্থ কারণ নির্দেশ করেননি।'

'শুনুন সাহেব', দুম করে একটা ঘুষি পড়ল টেবিলে।

'জানেন একটা জুট মিলে সত্যি সত্যি এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে। আপনি বলছেন কষ্টকল্পনা।'

মুনতাসীরকে কারো সঙ্গে কোনদিন তর্ক করতে শুনিনি। খালেদ তো হামেশা তর্কের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়াচ্ছে। ভারি আশঙ্কা করেছিলাম, পাছে অঘটন কিছু ঘটে যায়। সংযত কণ্ঠে বলল মুনতাসীর।

'পৃথিবীতে অনেক ঘটনা সত্যি ঘটে, সেসব ঘটনা মাত্র গল্প নয়। কেবল তাই গল্প যা লেখক লিখে। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া আর কী?' খালেদ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

'বললে হয়ত রাগ করবেন, শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে আপনার চাক্ষুষ পরিচয় নেই। মনে হয় এম এ পাস করার পর সকলে গিয়ে শ্রমিক হয়েছে। ওদের মানসিকতার সঙ্গে আপনার গল্পের চরিত্রদের মানসিকতায় অনেক তফাত। তফাতটা সূক্ষ্ম নয়—স্থূল। সে প্রভেদটুকু ধরতে পারেননি বলে অনেক অবান্তর কথা বলতে হয়েছে।'

'দু-একটা দেখিয়ে দেন না, যেমন...'

আক্কাচ আলীকে দিয়ে বলিয়েছেন, ডাস ক্যাপিটালের অনেক বড় বড় বুলি। আমাদের দেশের শ্রমিকেরা ডাস ক্যাপিটাল নয়, খবরের কাগজও পড়ে না। সংলাপের কথাগুলো তাদের জীবনের যন্ত্রণা থেকে আসেনি। আপনি নিজের কথা জুড়ে দিয়েছেন এবং জোড়াটা আলগা হয়ে চোখে পড়ে।'

'তা হলে আপনি শ্রমিক কৃষকের জাগরণে বিশ্বাসী নন?'

'আমি সকল মানুষের জাগরণে বিশ্বাসী।'

'লেখকদের কি উচিত নয়, তাদের সঠিক পথ বাতলে দেওয়া?'

'লেখকদের তো অনেক কিছু উচিত। কিন্তু তার আগে লেখকদের কি উচিত নয়, যে শ্রেণীকে উপদেশ দিচ্ছেন, তাদের চরিত্র এবং মানসিকতা সম্বন্ধে সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল হওয়া। শ্রমিকদের দেখলেন না, জানলেন না, পথ বাতলানো দরকার মনে করলেন, অমনি নরম বিছানায় ঘুমিয়ে গল্প ফেঁদে বসলেন। সেটা কি উচিত?'

'শ্রমিকের জীবনধারা সম্বন্ধে জানিনে বলে কি লিখব না?'

'না', বলল মুনতাসীর।

'তা হলে আজকের রুশ চীনের লেখকেরা শ্রমিক কৃষকদের নিয়ে যে লিখছেন, সেগুলোও কি আপনার পবিত্র দৃষ্টিতে সাহিত্য নয়?'

'সাহিত্য সাহিত্যই, শ্রমিককে নিয়ে লিখুন, আর বড় লোককে নিয়ে লিখুন এবং মানুষ-মানুষ। কথায় কথায় রুশ চীনের দোহাই দিলে নিজেদের অজ্ঞতা ও আলস্য ঢাকা পড়ে না।'

'অভাব থেকে, অত্যাচার থেকে জেগে ওঠার বাণী কি সাহিত্যে ঝঙ্কৃত হবে না?' বলল খালেদ।

'কেন হবে না? নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু শুধুমাত্র ভাতের লোভ দেখিয়ে লোক ক্ষেপানোর নাম মানবতার মুক্তি ঘোষণা নয়। সে কাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর মোল্লার। লোককে ক্ষেপিয়ে রায়ট লাগানো যায়, কিন্তু কোন চিরকালীন কল্যাণ ব্রতে টেনে আনা যায় না। লোভী মানুষেরা চিরকাল ক্ষমতার লোভে অজ্ঞ মানুষকে চেতিয়ে আসছে। সাহিত্যিকের কাজ মানুষের সমষ্টিগত জীবনের পূর্ণাঙ্গ একটা ধারণা দেওয়া। সে কাজ অনেকটা নির্মোহ বিজ্ঞানীর।'

'পল্টনের সভায় মৌলানা সাহেব কি বলেছেন জানেন?' মুনতাসীর বলল জানার আগ্রহ নেই আমার। ওসব অশ্রুসর্বস্ব পিরেরা জান্নাত কিংবা জান্নাতের মত লোভনীয় কিছুর লোভ দেখিয়ে চিরটা কাল সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে আসছে।'

খালেদ বিরক্ত হয়ে সিগারেট ধরাল। কড়াকড়া টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। মুনতাসীরকে যত সহজে উড়িয়ে দেবে ভেবেছিল, অত কোমল সে নয়। উল্টো নিজেই বেকায়দায় পড়ল। সিগারেটটা ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল

'তা হলে আপনি মৌলানা সাহেবকে বিশ্বাস করেন না?'

'না করিনে। তার কথা বিশ্বাস করলে পরকালের কথাও বিশ্বেস করতে হয়। অত নিশ্চিন্ত বিশ্বাস আমার নেই পরকালে। শুধু মৌলানা সাহেব কেন, গাই বলদে চাষ করা তেমন কোন নেতার কথাই আমি বিশ্বাস করিনে।'

পাশের সিটের মোল্লা গোছের ছাত্রটি দুটি জ্বালাভরা চোখ দিয়ে মুনতাসীরকে বিঁধতে থাকে। পরকালের প্রতি আস্থাহীন এ শয়তানটির সঙ্গে এতকাল কেমন করে, ভাল ব্যবহার করে আসছেন তিনি, ভেবে পান না। এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি, আমাদের অপর রুমমেট মুজতাহিদ সাহেব রক্তে মাংসে বিশ্বাস করেন, দুনিয়াতে আবার ইসলাম জিন্দা হবে এবং তা হবে আরেক কারবালার পর। সে যাক, খালেদ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। জিজ্ঞেস করল মুনতাসীরকে

'তা হলে আপনার বিশ্বাস কোথায়, মৌলানা সাহেবের মত মানুষের ওপর আপনি বিরক্ত। আপনার মতে সকল নেতাই গাই বলদে চাষ করেন।'

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন খালেদ সাহেব। আমি বলছিলাম কোন নেতার মধ্যেই বিশুদ্ধ কল্যাণ বোধ নেই এখন। কেউ কেউ মুখে মুখে কল্যাণের কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে এমন সব বিশ্বাসকে পুষে রাখেন, দেখলে ঘেন্না হয়। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে আশা করার মত কিছু নেই। অনেকের কল্যাণ করার ইচ্ছে হয়ত আছে। কিন্তু তাদের চিন্তা পীড়িত, চেতনা আচ্ছন্ন, দৃষ্টি সীমিত। সেজন্য তাঁরা সব সময়ে গরুর গাড়ির সঙ্গে রকেট এঞ্জিনের পার্টস সংযোজন করতে চান। তা হবার নয়। দেশ জনতার কল্যাণ যে-কোন লোক ইচ্ছা করলেই করতে পারে না। সেজন্য মনীষা, আন্তরিকতা, প্রীতি এসবেরই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে সে জিনিসগুলোই নেই। নিজেরা এক একটা কুসংস্কারের ডিপো। অথচ দেশের মধ্যে জ্ঞানের সূর্য জ্বালাবার দুঃসাহস করেন। ওটা নেহায়েত ফাঁকিবাজি। এ পর্যন্ত একজন নেতার নাম বলুন যিনি রাজনীতি করে পয়সাঅলা হননি। তাই বলছিলাম, শ্রমিকদের নিয়ে সাহিত্য করার আগে ওদেরকে জানতে হবে। নিজে তাদের একজন হয়ে তাদের মত করেই লিখতে হবে। তখনই সত্যি কথা লিখতে পারবেন। ওদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে থেকেই থিয়োরিকে আবিষ্কার করতে হবে। থিয়োরি একটা জানেন বলে ভাসাভাসাভাবে প্রয়োগ দেখিয়ে যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, তা হলে আমার বলার কিছু নেই। রুশ চীনের কথা অনেকেই বলে। সেসব দেশে সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে, অনেক কিছু হওয়া সম্ভব এবং হচ্ছেও। আমাদের দেশে যা সম্ভব হচ্ছে না, অসম্ভবকে নিয়েই টানাটানি করেছে সকলে। যেমন ধরুন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে জানেন, তাদের নিয়ে লেখাটা আপনার পক্ষে সহজ। কিন্তু আপনি লিখতে গেলেন শ্রমিকদের নিয়ে গল্প। সে গল্পে না জানার আস্ফালন ছাড়া আর কিই বা থাকবে।'

শেষের কথাগুলো মনে হল খালেদ মনোযোগ দিয়ে শুনল। বাইরে কিন্তু চেলাগিরির ভাবটা বজায় রাখল। তাচ্ছিল্যভাবে আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বলল :

'তা হলে আজ আসি মুনতাসীর সাহেব। অন্যদিন আপনার সঙ্গে কথা হবে। আমার আবার অল পার্টির মিটিং আছে কিনা।' চলে গেল খালেদ।

'তা হলে মুনতাসীর সাহেব আপনি পরকালে বিশ্বাস করেন না?'

'না,' জবাব দিল মুনতাসীর।

'এতকাল জানতাম না।'

'এখন তো জানলেন,' দৃঢ়স্বরে বলল মুনতাসীর। মুখ দিয়ে চায়ের ফুটন্ত কেতলির মত আওয়াজ করতে করতে মুজতাহিদ সাহেব বেরিয়ে পড়লেন।

২

পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হল অরাজক যুগের তাণ্ডব। বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিশ-পঁচিশ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের চাতালে হকিস্টিক হাতে এমাথা থেকে ওমাথা হাঁটাহাঁটি করছে। নিরীহ ছাত্রেরা ভয়ে কাঁপছে। মেয়েরা কমনরুমের দোর আটকে হারেমবাসিনী হয়ে আছে। অধ্যাপকবৃন্দ ডিপার্টমেন্টের মধ্যে থর থর করে কাঁপছেন। মধুর ক্যান্টিনে কেউ নেই। বয়-বেয়ারা ছাড়া। চারদিকে থমথমে নীরবতা। শকুন উড়ছে আকাশে। চিল কাঁদছে চিঁ-হি স্বরে। মৃত মানবতার জন্য শোক করার মত কেউ নেই। জ্বল জ্বলে রোদ্দুরে ধাতব নগরী ঝক ঝক করছে। দশটা, এগারোটা, বারোটা তারপর বাজল একটা। বহু দিনের বুড়ো বেয়ারা আদম আলী ঘণ্টা বাজাল। পাঁজরে আঘাত খেয়ে কেঁদে উঠল কাঁসার ঘণ্টা। বাতাস কেটে কেটে সে কান্না কোলাহলমুখর নগরীর বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

হকিস্টিক হাতে মোটর সাইকেল থেকে নামল প্রায় জনাদশেক, যারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল, শুরু হল মারপিট। একধারসে পিটিয়ে চলল তিরিশ জনের মত সবল, সুঠাম লোক। মধু গালে হাত দিয়ে বসল। আক্রান্ত ছাত্রেরা বাঁচবার জন্য ক্যান্টিনে ঢুকেছিল। সেখানে এসে মেরেছে। ধস্তাধস্তি হেঁচকা হেঁচকিতে সব কাপ ডিস ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বুড়ো বেয়ারা আদম আলী বাঁ হাতের তালুতে চোখ ঘষে কাঁদতে থাকল।

'হায়রে আল্লাহ মৈলাম না ক্যান, ইনিভার্সিটিতেও ডাকাইতে মেলা করে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম থেকে বেল বাজাচ্ছে। এমন কোনদিন দেখেনি। ক্লাসের চেয়ার টেবিল সব একাকার হয়ে গেছে। ছাত্রেরা পালাচ্ছে। মেয়েরা কমন রুমের ভেতর বেতস লতার মত কাঁপছে। হকি স্টিকঅলারা পলায়মান বিশেষ বিশেষ ছাত্রকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে গেরোতে গেরোতে পিটোচ্ছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। এখনো স্মরণে এলে আমার মুখ দিয়ে রক্তবমি বেরিয়ে আসতে চায়। এক ঘণ্টার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাতাল খালি হয়ে গেল। পড়ে আছে আহতের দল-সংজ্ঞাহীন। রাস্তার কুকুরেরা এসে জিভ দিয়ে রক্ত চাটতে লাগল। আর চিলটা চিঁ-হি স্বরে ঘুরে ঘুরে কাঁদছিল।

হকি স্টিকঅলারা গোল হয়ে আলোচনায় বসল। গলায় কোকোকোলা ঢেলে বিজয়োৎসব করছে যেন। কেউ উর্দু ছবির গানের কলি গাইছে। সকলে চাঙ্গা হয়ে উঠে ছুটল অধ্যাপক আশরাফ সাহেবের বাসার দিকে। তিনি একদিন তাদের একজনকে ক্লাস থেকে বের করে দিয়েছিলেন। সুতরাং আজকে শোধ নেওয়ার সুযোগ ছাড়বে কেন? আগেই বলেছি, আমি চটুল যুবক। কোন কিছুর গভীরে প্রবেশ করিনে। দূর থেকে দেখাই আমার নেশা। নিজেকে বাঁচাবার পথ পরিষ্কার রেখেই সব সময় পা বাড়াই। দূর থেকে দেখলাম, আশরাফ সাহেবের বাসার জিনিসপত্রের দুর্দশা। ঘরের আসবাবপত্র ভেঙে ফেলছে হকিস্টিকের আঘাতে। টেলিভিশন ভাঙল, রেডিও ভাঙল। বই ভর্তি কাচের আলমারিগুলোর কাচ ঝন ঝন করে ভেঙে পড়তে লাগল। দেওয়ালের অয়েল পেন্টিং, কাপড়-চোপড়, জামা-প্যান্ট, শাড়ি, ব্লাউজ, ওড়না আর বই। অনেক বই বারান্দার কোণে এনে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুনের লকলকে জিহ্বা আস্তে আস্তে চওড়া হচ্ছিল। বাতাসে কাপড় পোড়া গন্ধ ছুটছিল। বইগুলো জ্বলছে এখন। মানব হৃদয়ের কালো মানিকের মালা আগুন গ্রাস করছে। আশরাফ সাহেব বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন। যেন তিনি এসব কিছু দেখছেন না। হাতে দাড়ি কামাবার একখানা রেজর। তিনি কিছুই দেখছেন না, যেন অর্থনীতির দুরূহ একটা সূত্রের মধ্যে তন্ময় হয়ে আছেন। সাবানমাখা মুখখানা দেখলে শিশুর মত লাগে। তিনি হাতের রেজরটা দিয়ে গলায় একটা পোঁচ বসিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন? আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। হঠাৎ যেন তাঁর খেয়াল হল। প্রিয় বইগুলো জ্বলে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি এসে হাত বাড়িয়ে দুখানা বই টেনে নিয়ে বুকের কাছে চেপে ধরলেন। গৃহদাহের সময় জননী যেমন করে কোলের শিশুকে চেপে ধরে।

ঠিক তখনই মাথায় হকিস্টিকের আঘাত পড়ল। প্রথম আঘাতেই মাথা কেটে গেল। তারপরে চলতে থাকল আঘাতের পর আঘাত। তাঁর স্ত্রী রক্ত দেখে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। ছোট বাচ্চাটি হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে। আমার মত একজন হাল্কা মানুষের পাঁজরগুলোও আঘাতে আঘাতে মটমট করে ভাঙতে লাগল যেন। সেদিনই প্রথম নিপীড়িতের বেদনা বাজল আমার ধর্মের গভীরে। সেদিনই অনুভব করলাম প্রথম, অত্যাচারীর প্রতি তীব্র ঘৃণায় আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রতিবাদের বাষ্প হয়ে টগবগ করে ফুটছে।

কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারিনি। নবলব্ধ চেতনায় এই যেন ঘুম থেকে উঠলাম। হকিস্টিকধারী বন্ধুদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। আশ্চর্য! বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খুনেদের মুখের আদলের কোন তফাত নেই। পাথরের মত জমে গেলাম আমি।

কোত্থেকে খালেদ ছুটে এল। পাগলের মত দেখাচ্ছে তাকে। মাথার চুল এলোমেলো। ধূলিধূসরিত মুখ। প্যান্টের নিচে ময়লার তরল দাগ। একটু আগে

যেন ড্রেনে পড়ে গিয়েছিল। আশরাফ সাহেবের বাড়ির সিঁড়ির গোড়ায় এসে চারদিকে তাকাল উদাস চোখে। কেউ নেই। সকলেই পালিয়েছে। ক্ষিপ্তের মত সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে আশরাফ সাহেবের ঘরে উঠে এল। বহ্নিমান বইয়ের স্তূপের পাশে পড়ে আছেন আশরাফ সাহেব— অচেতন। তাঁর দুচোখে দুফোঁটা অশ্রু টলমল করে উঠল। আমার মনে হল, অরাজক যুগ যেন কাঁদছে। চিৎকার করে বলল

আপনারা অধ্যাপকের বইপত্তর জ্বালিয়ে দিলেন, তাঁকে মেরে অচেতন করে ফেললেন, বিশ্ববিদ্যালয়টাও জ্বালিয়ে দিন। কি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে! গলায় মাফলার বাঁধা একজন ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিল তার গালে। আরেকজন হকিস্টিক দিয়ে মাথায় কসে আঘাত করল। মাথাটা কেটে গিয়ে দরদর বেগে রক্ত ছুটল। 'মাগো' বলে চিৎকার করে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে এসে দৌড়ুতে শুরু করল। হকিস্টিকঅলা দুজন তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করল শিকারি কুকুরের মত।

মুনতাসীর আসছিল পাবলিক লাইব্রেরির রাস্তা দিয়ে। যেন স্বপ্নের মধ্যেই পথ চলছিল সে। বালবের মত চোখ দুটো প্রসারিত করে চারদিক দেখে দেখে হেলে দুলে হাঁটছিল। জারুল গাছে থোবা থোবা ফুল ধরেছে। অপরাজিতা ফুলের মত নীল হয়েছে আকাশ। দূর থেকে দেখল খালেদ আসছে, দেখল পেছনে থেকে দুজন, হকিস্টিক হাতে ছুটিয়ে নিয়ে আসছে তাকে। খালেদের জামা কাপড়ে রক্তের দাগ। মাথা দিয়ে উৎসের মত রক্ত ছুটছে। তক্ষুণি কর্তব্য স্থির করে ফেলল মুনতাসীর।

চশমা জোড়া খুলে পকেটে পুরে রাখল। অ্যাটোমিক অ্যানার্জি সেন্টারের উত্তর দিকে যেখানে ইটের স্তূপ সেখানে এল। হকিস্টিকধারী দুজন সামনে এলেই একজনের নাক মুখ লক্ষ্য করে একখানা ইট ছুঁড়ে দিল। ইটের আঘাতে স্টিকঅলার একটা দাঁত গেল। আরেকজন মুনতাসীরের দিকে স্টিক বাগিয়ে আসতে আরেকখানা ইট ছুড়ে দিল। গায়ে লাগল না। মুনতাসীর ইট ছুঁড়তে লাগল। যাতে করে দুজনের কেউ ইটের স্তূপের কাছে না ঘেঁষতে পারে। ওরা পিছু হটতে শুরু করছে। আহত সঙ্গীটিকে ফেলে দুজন পলায়ন করল। তারপর দাঁতভাঙা জন হকিস্টিকটা ফেলে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেল।

খালেদও কদ্দুর গিয়ে অবস্থা দেখে মুনতাসীরের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আগের মত তার মাথা বেয়ে রক্ত ছুটছে দরদর বিগলিত ধারায়। আমি অবাক হয়ে মুনতাসীরকে দেখছিলাম। একি সেই মুনতাসীর! যার সঙ্গী সব কালো বই, যে বাস করে স্বপ্নের জগতে, গালজোড়ায় যার চিক চিক করে স্বপ্ন নেচে যায়। এখনকার চেহারা দেখছি মুনতাসীরের। মুখের রক্তবাহী শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। শিমুল ফুলের মত লাল হয়েছে মুখমণ্ডল। চিকন চিকন দাঁতে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরেছে। মাথার উপরে থির সূর্যের উত্তাপ। হাজার কাপুরুষের

দেশে, ইটের স্তূপের পাশে দাঁড়ানো মুনতাসীরকে দেখছিলাম। দেখছিলাম, সাহস আর পৌরুষের ঝলমলানো একটি স্ফুলিঙ্গের মত, আগুনের আঁচে উত্তপ্ত একখণ্ড ইস্পাত যেন! আমি গুটি গুটি পায়ে মুনতাসীর আর খালেদের পাশে চলে গেলাম। নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার বাইরে আমার প্রথম পদক্ষেপ। একটুকুও ভাবিনি, আমার যে কোন বিপদ হতে পারে। ঐ শিমুল ফুলের মত সাহস রাঙা মুখখানি আমাকে 'আয় আয়' করে ডাকল। আমি নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

আমি ওদের পাশে এসে দাঁড়ালুম। মুনতাসীর জিজ্ঞেস করল

'কী হয়েছে?' আওয়াজ তো নয় যেন পিস্তলের গুলি। আমি বললাম।

হকিস্টিকধারী ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে মারপিট করেছে। অনেক ছাত্র মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। তারপরে তারা, আশরাফ সাহেবের ঘরে আগুন লাগিয়েছে। তিনি এখন সংজ্ঞাহীন।

'বিশজনের মত লোক এতগুলো ছাত্রকে আহত করল, অধ্যাপককে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলল, তাঁর ঘরে আগুন লাগাল, অন্যান্য ছাত্রেরা কোথায় ছিল।'

মনে মনে বললাম, সে কথা অরাজক যুগের বাতাসের কাছে জিজ্ঞেস কর। মুখে বললুম

'তারাও ছিল।'

'কোথায় ছিল?'

'সকলে পালিয়েছিল।'

'তুমি বাধা দাওনি কেন?'

'এতগুলো খুনের সঙ্গে আমি কি করব?' জবাব দিলাম আমি।

'ছ হাজার ছাত্রকে বিশজন গুণ্ডার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলনি কেন?'

আমি জবাব দিলাম না। আবার জিজ্ঞেস করল :

'তোমার সামনেই বুঝি খালেদের মাথা ফাটিয়েছে।'

মাথা নাড়ালাম।

'কাওয়ার্ড!' সমস্ত শরীরটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে কেঁপে গেল। বুকের ভেতর কী যেন একটা চাপতে চেষ্টা করছে। সে কাঁপছে আর তিনটে দাঁত মাংসের ভেতর বসে যাচ্ছে। তিনটি রক্তের ধারা থুতনি বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসছে। সে তিনটে রক্তের ধারা আমার বুকে চিরদিনের জন্য আঁকা হয়ে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা পরে দেখলাম আট-দশজন হকিস্টিকধারী আমাদের দিকে বুনো মোষের মত তেড়ে আসছে। আমি পালিয়ে আত্মরক্ষা করার কথা ভুলে গেলাম। মুনতাসীর আর খালেদের সঙ্গে কোথায় যেন একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছি। খালেদের মাথা দিয়ে রক্ত বইছে চিরচির করে। মুনতাসীর বলল

'এখন তো আর রক্তটা বন্ধ করার উপায় নেই। আগে এদেরকে একটু সামলে নিই। ইট নিয়ে তৈরি থাকুন। সাহসের সঙ্গে নাকে মুখে ছুঁড়তে থাকবেন। দেখে দেখে ছুঁড়বেন, যেন একটাও বৃথা না যায়। খবরদার পালাবার চেষ্টা করবেন না।'

'আমরা সুবিধাজনক স্থানে আছি।'

পেছনে স্তূপীকৃত ইট দেখে আমার মনে হল, চল্লিশজন এলেও পারবে না। এ ইট বস্তুটিকে এতকাল দেখিনি কেন।

সেজন্য ভারি আফসোস হয়। মুনতাসীরের কালো কালো বইয়ের ভেতর কি এ ইটের কথা লেখা ছিল? হকিস্টিকঅলারা আমাদের মার দিতে এসেছিল, খেতে আসেনি। সেজন্য পরে দেখে নেবে বলে শাসাল। রোকেয়া হলের জারুল গাছটির নিচে দাঁড়িয়ে হকিস্টিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদেরকে শালা ইত্যাদি বলে এক চোট গাল দিল। তারপর ওরা জিন্নাহ হলের দিকে চলে গেল।

'দেখলেন তো, সত্যিকারের সাহস আর গুণ্ডামিতে কতটুকু প্রভেদ।' বলল মুনতাসীর।

কিছু বললাম না মুখে। মনে মনে আস্ত একটা যুদ্ধজয়ের পুলক অনুভব করলাম। নেমে এলাম পথে। নিজের গায়ের নতুন শার্টটা খুলে খালেদের মাথায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল মুনতাসীর। জামা দিয়ে যে ব্যান্ডেজ হতে পারে, তাও আমি কোনদিন চিন্তা করিনি। তিনজনে এলাম হলে। একজন ছাত্রও নেই; সকলে পলাতক। দারোয়ানটি বসে আছে অধঃমুখে। তার বিষণ্ন চোখ মুখ যেন অরাজক যুগের একখানা জলরঙা ছবি।

'আমাদের এক্ষুণি হল থেকে চলে যাওয়া উচিত। নয়ত রাতেরবেলা ওরা এসে আমাদেরকে আক্রমণ করবে। হলের সব ছেলেরা চলে গেছে।

'হোয়াট!' আবার সে পিস্তলের গুলির মত আওয়াজ।

আমি বললাম :

'অন্যান্য বারে হলে ঢুকে ওরা সাধারণ ছাত্রদের আক্রমণ করেছে। লেপ, তোষক, বইপত্তর জ্বালিয়ে দিয়েছে। এবারও তারা আক্রমণ করবে। এবং আমাদেরকেই আক্রমণ করবে।'

'আক্রমণ করবে তো করুক। গুণ্ডার গুণ্ডামির ভয়ে আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেব না। হলে আমি ভাড়া দিয়ে থাকি। জীবন দিয়ে হলেও সে অধিকার আমি প্রতিষ্ঠিত করব। তোমাদের ভয় লাগে, তোমরা যেতে পার।'

মুনতাসীরের থুতনিতে তিনটে চিকন রক্তের ধারা এখনো শুকোয়নি।

'আমি আপনার সঙ্গেই থাকব। প্রাণ যায়, যাক্ কাপুরুষের সংখ্যা আর বাড়াব না।' বলল খালেদ।

রয়ে গেলাম তিনজন। নিরাপত্তার জন্য মশারির লোহার স্ট্যান্ডগুলো ভেঙে নিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে, হলে, সর্বত্র থমথমে নিস্তব্ধতা। সব ছাত্রের রান্না

হয়েছে, কিন্তু খেতে আসেনি কেউ। বিশজন হকিস্টিকধারী ছ হাজার ছাত্রকে ন্যায্য অধিকার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। রাত নেমেছে। নক্ষত্রজ্বলা রাত। বর্শার ফলার মত সাহসী আলো। রুপোলি অশ্রুতে চাঁদ গাইছে সে করুণ কাহিনী— এ যুগের সবচেয়ে কলঙ্কজনক কাহিনী, যেজন্য আমাদের উত্তরপুরুষেরা আমাদেরকে কোনদিন ক্ষমা করবে না। ছ হাজার ছাত্রের চোখের সামনে তাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বিশজন গুণ্ডার হাতে মার খেলেন।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে মুনতাসীর। বাইরের দিকে। একখানা হাত গালে। কী ভাবছে? তাকে এমন আপনার করে কোনদিন পাইনি। দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে ইচ্ছে হল। বলতে শখ হল, তোমার মত মানুষের সঙ্গে মরতেও রাজি মুনতাসীর। কিন্তু পারলাম না। কোথায় যেন আটকে গেল কণ্ঠস্বর। কথা বলল খালেদ। আন্তরিকতায় ভরা কলসি উপচে পড়ছে কণ্ঠস্বরে।

'আচ্ছা মুনতাসীর সাহেব, আপনি আমাদের সমর্থন করেন না কেন?'

'আপনাদেরকে সমর্থন করলে তো আপনাকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিতে হত।' মুনতাসীরের কণ্ঠে ঈষৎ পরিহাসের আভাস।

খালেদ চুপ করে রইল। কী যেন গভীরভাবে ভাবছে। একটু থেমে আবার বলল

'আচ্ছা, পালানোর সঙ্গে আদর্শের কী কোন সম্পর্ক আছে। পালায় তো সাহস নেই বলে।'

'অবশ্যই সম্পর্ক আছে। দুর্বলকে শক্তি দেওয়ার জন্যেই তো আদর্শ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য না হলে আদর্শ দিয়ে করবেন টা কি শুনি?

'তা হলে আমাদের মধ্যে একজনও আদর্শবান নেই?'

'কথাটা দুঃখজনক হলেও সত্যি।' বলল মুনতাসীর।

খালেদের মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। মনে হল এক্ষুণি কাঁদবে।

'তা হলে আমরা যে এত সভা করলাম, এত স্লোগান দিলাম, মিছিল করলাম, জেল খাটলাম, পড়াশুনা করলাম, সে সব কি মিথ্যে?

'না মিথ্যে নয়, তাতে সত্যিও যথেষ্ট নেই। অরাজক যুগের একরকম হুজুগ বলতে পারেন। কারণ যারা স্লোগান দিচ্ছে, মিছিল করছে, জেল খাটছে, তারাও প্রাণের থেকে চায় না এ সমাজের পরিবর্তন হোক। সেজন্য গুলিস্তান পর্যন্ত মিছিল করে মনে করে, লং মার্চ করে এলাম। আমাদের ভেতরে স্তরের পর স্তর এত কুসংস্কার— অন্তর দিয়ে কোন কিছুকে গ্রহণ করতে পারিনে। আমাদের রক্ত মাংসে সত্যের আগুন জ্বলে না। রোমান্টিকতার বাইরে এক কদম দেবার সামর্থ্যও আমাদের নেই।

'তা হলে এখন উপায়?'

'উপায়ের কথা চিন্তা করলে তো? কেউ তো সে কথা ভাবছে না। সবাই আছে নিজ নিজ আত্ম প্রসাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে।'

'সাহিত্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে কি কিছু করা যায় না? মুনতাসীর সাহিত্যের নামে জ্বলে উঠল।

'সাহিত্যের কথা আর বলবেন না। এ দেশে সাহিত্য আছে নাকি? সাহিত্যিকদের দেখলে আমার ঘেন্না হয়। একদল নুনের ঠোঙার মত কাঁচা যৌবনের বেসাতি করছে। আরেকজন লিভিডোর ফাঁদে আটকা পড়েছে। কেউ কেউ শাহবাগ হোটেলে মিটিং করে জনগণের সাহিত্য করার জন্য নসিহত করছেন। প্রবীণ সাহিত্যিকদের দেখলে আমার বর্ষীয়সী বারাঙ্গানার কথা মনে হয়। আর কেউ কেউ সাহিত্য বলতে বোঝেন বিদেশি নেতার বাণী। আমাদেরকে ঘিরে রয়েছে এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। শুয়োরের মত আদর্শের নামে, মানবতার নামে খুব উঁচু একটা লাফ দিয়ে আবার পুরোনো কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। রাজনীতি নেই, সাহিত্য কাদায় নেমেছে— নামতে বাধ্য।'

'মুনতাসীর সাহেব, আমাদের রাজনীতি নেই, সাহিত্য নেই, তা হলে কী আছে আমাদের?'

মুনতাসীর হাসল।

'কী নেই খালেদ সাহেব আমাদের? মোল্লা আছে, মৌলানা আছে, রসের কথা লেখার সাহিত্যিক আছে, যাত্রাদলের রাজনীতি আছে, ড্রয়িং রুমের সংস্কৃতি আছে, গুলিস্তান পর্যন্ত লং মার্চ আছে। মেঘনার তরল পলির মত স্তরে স্তরে কুসংস্কার আছে, অত্যাচার আছে, নির্যাতন আছে। দোকানদার আছে, শিল্পপতি আছে, মাদ্রাসা, মসজিদ, অধ্যাপক, সাংবাদিক সব আছে। কী চাই বলুন না।'

'আপনি ব্যাপারটাকে পরিহাস করে উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমি আন্তরিকভাবে দেখতে অনুরোধ করছিলুম।'

'আন্তরিকভাবে দেখেই পরিহাস করছি। প্রতিপক্ষ যদি প্রবল হয় তা হলে পরিহাস করাটাই সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ।'

'তা হলে পথ নেই আমাদের কোন?'

'কেন পথ থাকবে না। পথ কি কোনকালে ঢাকা থাকে? তবে সে পথ প্রচলিত রাজপথ নয়। আমাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি আদর্শের বড় নামের ঢোলা জামা পরে যে দিকে ছুটেছে, সে লক্ষ্য বস্তুটির নাম অন্ধকার।

'আমরা কোথায় যাব?'

'আমাদেরকে গোড়া থেকেই শুরু করতে হবে। তা ছাড়া আর পথ নেই কোন?'

'সে কী রকম?'

'সম্পূর্ণ নতুনভাবে চিন্তা করতে হবে। আমাদের অধ্যাপকেরা যা লিখেছেন, ভুলে যেতে হবে। সাংবাদিকেরা যা লেখেন, অবিশ্বাস করতে হবে, রাজনীতিবিদেরা যা বলেন, মনে করতে হবে সব ফাঁকি। মুসলমান সমাজ এখনো চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে রামমোহনের স্তর অতিক্রম করেনি। যাঁদেরকে ভয়ঙ্কর প্রগতিশীল মনে করে সভা করে গলায় মালা দুলিয়ে দিই, তারাও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভাল করে টিপে দেখুন, দেখবেন, মানুষপচা গন্ধ বের হয়। ভেতরে নোংরা, ওপরের চটকদার চেহারাটুকুই চোখে পড়ছে। রাজনীতিবিদেরা যুবকদেরকে সমাজ পরিবর্তনের কাজে না লাগিয়ে তোষামোদের কাজে লাগিয়েছে। তাতে করে যুবশক্তির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। এ স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ থেকে বাঁচতে হলে একেকজন যুবককে একেকটি পারমাণবিক বোমার মত বিস্ফোরণক্ষম হতে হবে।'

'তাই তো,' খালেদ কেমন যেন ভাবনায় পড়ে গেল।

'এ কেমন করে সম্ভব।'

'অবশ্যই সম্ভব। এমনি করেই অন্ধকার যুগের গর্ভযন্ত্রণা সৃষ্টিশীল যুগের জন্ম দিয়েছে। আমাদের সৃষ্টিশীল চিন্তার অভিঘাতে পুরোনো যুগ তলিয়ে যাবে। পাঁজর ফাটানো চিন্তা বিজলির মত জ্বলবে যখন, আবার নতুন যুগ আসবে। এখন শুধু বলা উচিত, যার বুকে সূর্য নেই, সে আমাদের বন্ধু নয়।'

'কিন্তু একটা প্রাথমিক কর্মসূচি চাই তো।'

'যেমন ধরুন প্রথমে একখানা কাগজ। তিন মাসে একবার বেরুক ক্ষতি নেই। ডিক্লেয়ারেশন হয়ত পাব না। তবু সংকলন নামে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। সে কাগজে সব রকম অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সব রকম সংস্কৃতির নেতির জোড়া খুলে খুলে দেখাবে। সমাজের ক্ষয়কাশের কারণ বিশ্লেষণ করবে। চাই একদল চিন্তাশীল নির্ভীক মানুষ, যারা দক্ষ সার্জনের মত সমাজ দেহে অস্ত্রোপচার করতে পারে। মানুষ কাঠ নয়। একদিন না একদিন সত্যকে গ্রহণ করবেই। তার জন্যে চাই সহনশীলতা, ধৈর্য আর গ্রহণ বর্জনের ক্ষমতা। সর্বোপরি সত্য প্রকাশের দুর্বার সাহস। এক সময় দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে সত্যের আগুন জ্বলে উঠবে। তখনই সম্ভব হবে খোলনলচে দুইই বদলে নতুন সমাজ গঠন করা, তার আগে নয়। বিদেশের দৃষ্টান্তে উল্লসিত হওয়া আর জান্নাতে বিশ্বাস করা একই রকম।

সে রাতে মুনতাসীর যদি বলত 'তোমাদের মরতে হবে, আমরা মরতাম' যদি জানালা দিয়ে লাফ দেওয়ার কথা বলত, আমরা লাফ দিতাম। একখানা সংকলন প্রকাশে রাজি হওয়া সে আর এমনকি! রাজি হয়ে গেলাম। তিনজনে মিলে কাগজের নাম রাখলাম 'অতন্দ্র'।

৩

'অতন্দ্র' প্রকাশের টাকা-পয়সা মুনতাসীর যোগাড় করবে, এরকম স্থির হল। লেখা সংগ্রহের দায়িত্ব খালেদের। আমাদের অপর বন্ধু আরশাদকে দেওয়া হল প্রেসের ভার। আমি ওদের সঙ্গে রইলাম অনেকটা না থাকার মত। মনের ভেতর একটা খুঁতখুঁতুনি রয়ে গেল। কাগজ করা, সে তো অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার। মুনতাসীর অত টাকা দেবে কোত্থেকে? মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলাম না। মুনতাসীরের মত দুঃসাহসী মানুষের সামনে টাকা-পয়সার অজুহাত দেখানো যেন তাকে অপমান করা। সে দুঃসাহসকে সম্বল করেই কাজে নেমে পড়া গেল।

কদিন থেকে আর মুনতাসীরের দেখা পাইনে। আমার ঘুম ভাঙবার আগেই সে বেরিয়ে যায় সকালবেলা। জানিনে, কোথায় যায়। দুপুরে ক্লাসে দেখি। তখন তাকে ভারি পরিশ্রান্ত দেখায়। কখন গিয়ে খেয়ে আসে। ফাঁকে ফাঁকে আবার বেরিয়ে যায়। ক্লাসের শেষে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে তহুরার সঙ্গে কথা বলে না। বেচারির স্তব্ধ মুখে আঁধার জমেছে কালো হয়ে। রাত নটা সাড়ে নটার সময় হলে ফেরে। তখন তাকে ঝোড়ো কাকের মত দেখায়। খেয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়ে চুপচাপ। কোন কথা বলে না। একদিন জিজ্ঞেস করে ফেললাম :

'মুনতাসীর আজকাল তুমি যে একেবারে রুমে থাকছ না, কী ব্যাপার! হঠাৎ এরকম পরিবর্তন।'

'তোমরা তো 'অতন্দ্রে'র অর্থ সংগ্রহের ভারটা আমার ওপরে ছেড়ে দিয়েছ। টাকাটা তো কেউ এমনিতে দেবে না। যোগাড় করে নিতে হচ্ছে।'

'কী করে?' বললাম আমি।

'সকালবেলা এক প্রকাশকের প্রুফ দেখি। দুপুরবেলা বিজ্ঞাপনের জন্য এক আধটু ঘোরাঘুরি করি। সন্ধেবেলা করি একখানা ট্যুইশনি। কোনরকমে যদি প্রথম সংখ্যাটা বের করতে পারি, বিজ্ঞাপনের টাকা দিয়ে পরবর্তী সংখ্যাগুলো চালিয়ে নেওয়া যাবে।'

ক্লাস ট্যুটোরিয়াল, প্রুফ দেখা, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ তার ওপর ট্যুইশনি। আমি চুপ হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, 'এত পরিশ্রম যদি হয়, লাভ কী কাগজ করে?'

আজকাল খালেদ আর আমাদের ছোট্ট আড্ডাটিতে আসে না। ঘুরে ঘুরে লেখা সংগ্রহ করে। একেকটি লেখা নিয়ে মুনতাসীর আর খালেদ অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে, তর্কাতর্কি হয়। মাঝে মাঝে আরশাদও যোগ দেয়। কোন বিশেষ লেখা ছাপবার জন্য অনুরোধ করে। মুনতাসীর শান্ত সংযত কণ্ঠে বলে

'না, ও-লেখা আমরা ছাপাতে পারব না। লেখাটি অন্যান্য কাগজের মান অনুসারে মন্দ হয়নি। তবু আমরা ছাপতে পারব না। কারণ ওতে বিশেষ একটি

মনোভঙ্গি এমন বিশ্রীভাবে দাঁত বের করে রয়েছে, তা আমাদের আদর্শের পরিপন্থী।'

খালেদ চুপ করে থাকে। আরশাদ ভ্রূকুটি করে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না। রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে ঘুরে মুনতাসীরের গায়ের রং তামাটে হয়ে এসেছে। গাল জোড়ায় আর বিকেলের লালিমা নাচে না, আর চোখে নীলিমা কাঁপে না। কণ্ঠস্বর রিনরিন করে বাজে না, কিন্তু কথাগুলো এসেছে ধারালো হয়ে। যুক্তি সংহত। বাইরের পৃথিবী মুনতাসীরকে নিজের ছাঁচে ঢালাই করে নিচ্ছিল। খালেদ কিংবা আরশাদের কোন অনুরোধ গ্রহণযোগ্য না হলে বুঝিয়ে দেয় যুক্তি দিয়ে। পয়লা এক আধটু গাঁই গুঁই করলেও খালেদ চুপ করে থাকে। আজকাল মুনতাসীরের ওপর তার এক অন্ধ অনুরুক্তি এসেছে। আরশাদ বাইরে কিছু না বললেও মনে মনে মুনতাসীরকে সহ্য করতে পারে না। চুপ করে রাগে ফুলতে থাকে।

অনেক বন্ধু-বান্ধবের লেখা ছাপাতে পারলাম না। দুজন নাম করা লেখকের লেখাও মুনতাসীর অমনোনীত করল। সে যাক, অবশেষে 'অতন্দ্র' বের হল। কাগজখানি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বোমার মত ফাটল। মুনতাসীর এ যুগের চিন্তা শূন্যতার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে। তাতে রাজনীতি, সংস্কৃতির দুর্বলতা কী কী স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে। কবি, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। খালেদ সত্যি একটা ভাল গল্প লিখেছিল। আমার মত একজন ভোঁতা কল্পনার মানুষের কলম দিয়ে আশ্চর্য একখানা কবিতা বেরিয়ে গিয়েছিল। কী শির শির করা অনুভূতি আমি ঢেলে দিয়েছিলাম। নিজের ভেতর কী এক শক্তিশালী প্রতিবাদী সত্তার উদ্বোধন ঘটেছিল। এখনো অবাক হয়ে সে কথাই ভাবি।

রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল মুনতাসীর। ওর হকিস্টিকঅলাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, 'অতন্দ্র' প্রকাশ, কাগজে প্রকাশিত তেজালো প্রবন্ধ সবকিছু নিয়ে ক্যান্টিনে জোর আলোচনা চলতে লাগল। কেউ বলল লোকটি পাগল, কেউ ফ্যান্টাস্টিক আর কেউ কেউ বলল জিনিয়স।

যে যাই বলুক, এদিকে মুনতাসীরের চোখে ঘুম নেই। এক-একজনের কাছে দশ-দশবার গিয়েও প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনের টাকা উসুল করতে পারছে না। দ্বিতীয় সংখ্যা বের করার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছে মুনতাসীর। এখন নাওয়া খাওয়ার সময় পাচ্ছে না। ক্লাসেও বড় একটা যায় না। প্রুফ দেখে, ট্যুইশনি করে। আর বিজ্ঞাপনের জন্য সারা শহরময় ছুটাছুটি করে। তার মুখের দিকে চেয়ে, মাঝে মাঝে অনুভব করতে চেষ্টা করি, বুকের ভেতর কী আগুন জ্বলছে। বুকের আগুনই মুনতাসীরকে বিবাগী বাউলের মত ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমাদের বিভাগীয় প্রধান আড়াই মাসের জন্য রোমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। 'রোমে আড়াই মাস' নাম দিয়ে তিনি এক ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। বইটি আরশাদকে দিয়েছেন 'অতন্দ্রে' আলোচনা করার জন্যে। সে প্রথম শ্রেণী নেওয়ার আশা করে। সে জন্যে বিভাগীয় প্রধানের নানারকম স্তুতিবর্ধক খুঁটিনাটির প্রতি অত্যন্ত সজাগ। বইটি মুনতাসীরকে দিয়ে বলল

'স্যার বইটি সম্বন্ধে আলোচনা করতে বলছেন।' মুনতাসীরের মুখ কালো হয়ে গেল। মনের কোন ভাবনা গোপন করতে পারে না। মুখে ছায়া ফেলে।

'আপনি করবেন না, আমি আলোচনা করব।' জিজ্ঞেস করল আশরাফ।

'আমিই করব।' ঋজু জবাব মুনতাসীরের।

দ্বিতীয় সংখ্যা বের হল কোনমতে।

'রোমে আড়াই মাস'এর আলোচনা দেখে আরশাদ চোখ কপালে তুলল। বিড় বিড় করে বলল

'এ্যাঁ! এসব কী কাণ্ড। স্যারের বইটির এমন আলোচনা করতে হয়। এখন আমি স্যারকে কী বলব? যত সব... ।'

মুনতাসীর জবাব দিল না।

আরশাদ 'অতন্দ্র' থেকে সটকে পড়ল। বিভাগীয় প্রধানকে গিয়ে কী বুঝাল জানিনে।

একদিন দেখলাম, মুনতাসীর মুখ কালো করে ক্যান্টিনে বসে আছে। এমন গোমড়ামুখো সে সাধারণত থাকে না। কঠিন বিপদের সময়ও তার মুখে এক ধরনের দীপ্তি খেলে। ব্যাপার কী জানতে চাইলাম আমি।

'কি মুনতাসীর মুখে কালি মেখে বসে আছ যে?'

হেসে উঠতে চাইল। এক ধরনের মানুষ আছে যারা কাঁদতে পারে না বলেই হাসে।

বিভাগীয় প্রধান মুনতাসীরের মাসিক স্কলারশিপ কেটে দিয়েছেন। আরো নাকি বলেছেন, যদি সংযত না হয় আচার-আচরণে, তা হলে বিভাগেও থাকতে পারবে না নাকি।

কদিন পরে দেখি মুনতাসীর রুমের মধ্যে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। নড়ন চড়ন নেই। একটা প্রচণ্ড কিছুর ধকল সইতে না পেরে ফুলে ফুলে উঠছে। সমস্ত শরীরটা যেন জোড়ায় জোড়ায় খুলে যাচ্ছে। নিজের অজ্ঞাতে বড় বড় নিশ্বাস নামছে নাক দিয়ে। যখন চুপচাপ থাকে, সে সাধারণত কারো সঙ্গে কথা বলে না। নিজের বেদনাকে নিজেই শান্ত করে। তার ভেতরের মাথাকুটা অস্থিরতা দেখে থাকতে পারলাম না। তাই জানতে চাইলুম :

'কী হয়েছে মুনতাসীর?'

'না কিছু না,' পাশ ফিরল তক্তপোশে।

'বল, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।'

যা বলল তাতে আমার শিরার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। আরশাদ নাকি 'অতন্দ্রে'র বিল বাবদ চার শ' টাকা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মুনতাসীর টাকার জন্য গেলে নাকি বলেছে, 'অতন্দ্রে'র জন্য যে শ্রম দিয়েছে, তার মূল্য নিশ্চয়ই চার শ' টাকার চাইতে অনেক বেশি।

তার পরদিন থেকে বিজ্ঞাপনের ফর্ম নিয়ে আবার নিয়মিত ঘুরে বেড়ায়, সরকারি বেসরকারি অফিসের দোরে দোরে। কেউ বিজ্ঞাপন দেয় না। এজেন্টদের কাছে যায়। কাগজ বিক্রি হয় না। তারা বলে সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবি আর সিনেমার খবর না থাকলে কাগজ বিক্রি হয় না। বুকস্টলগুলোতে রংচঙে সিনেমা পত্রিকা আর জমকালো বিদেশি পত্রিকার ভিড়ের চাপে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে 'অতন্দ্র'। নিউজপ্রিন্টে ছাপা, বিশ-পঁচিশ পৃষ্ঠার কাগজ। খদ্দেরের চোখ টানে না। তবু হাতে করে নিয়ে গিয়ে এখানে সেখানে কিছু কপি বিক্রি করে আসে। অল্পস্বল্প বিজ্ঞাপনের টাকা আর বিক্রয়ের যৎকিঞ্চিত অর্থে পরের সংখ্যা বের করে। কলেবর ক্ষীণ হয়ে আসে 'অতন্দ্রে'র।

মুনতাসীরকে নিয়ে আর কেউ আলোচনা করে না। এখন তার মাথার চুলে তেল পড়ে না। নিয়মিত টিফিন জোটে না। পয়সা নেই। বাসেও চড়তে পায় না। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে সারা শহরে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় গিয়ে তহুরার সঙ্গে দেখা করে। তার ভাঙা চোয়াল এবং কোটরাগত চোখ দুটোর দিকে চেয়ে তহুরার বুকের রক্তরোদন মুখের রেখায় রেখায় জেগে ওঠে। মুনতাসীরের মুখের ঢলঢল লাবণি অরাজক যুগের সূর্য শুষে নিয়েছে। এককালের স্বপ্নিল গণ্ড দেশে এখন দুটো দৃঢ়তার তামাভ রেখা। আর চশমার নিচে ছাই চাপা আগুনের মত দুটি চোখ ছাড়া আর কিছু নেই মুনতাসীরের।

আমরা সে ভয়াবহ দিন, ভয়াবহ রাতের কথা ভুলে গেছি। ভুলে যাওয়াই আমাদের স্বভাব। অরাজক যুগ নতুন নতুন হুজুগ বয়ে আনে। আমাদের স্লোগান দেওয়ার পালা আসে, আসে প্রতিবাদ করার, প্রেমে পড়ার, রোমান্টিক হওয়ার মৌসুম। ইতোমধ্যে খালেদ তার দলের কর্তাব্যক্তি হয়ে উঠেছে। প্রভুত্বের উত্তাপে আবার তার ছাতি ফুলে উঠল। বাইরে সমীহ করেন কিন্তু মনে মনে অবজ্ঞা, হয়ত ঘেন্নাও করে। 'অতন্দ্র' নিয়ে মাথা ঘামায় না বিশেষ। চাইলে একটা লেখা দেয়, এই যা সম্পর্ক। দলের লোকদের নতুন নতুন কর্মসূচির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে।

এখনো 'অতন্দ্র' বের হয়। এখনো মুনতাসীর রাজনীতি, সংস্কৃতির চেলাদের বিরুদ্ধে আগুনঝরা ভাষাতে প্রতিবাদ করে। বন্ধু-বান্ধবেরা হাসে, টিটকিরি দেয়। বুকের আলো পথ দেখায় তাকে। নীরবে অতি নীরবে কঠিন কঠিন কাজগুলো করে যায় একটার পর একটা। একদিন যে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে পাবলিক লাইব্রেরির পাশে রুখে দাঁড়িয়েছিল তারাই এক সন্ধেবেলা এক হাজার

ছাত্রের সামনে বেদম মার মারল তাকে। মাথাটা ফেটে গেছে। শরীরের নানাস্থানে জখম হয়েছে। রক্তাক্ত মাথাটা চেপে ধরে হলে এল। খালেদ মিটিং করছে। সুতরাং সময় নেই। আমিও দু-একবার আহা উঁহুঁ করে, খালাতো ভায়ের সঙ্গে দেখা করার অজুহাত দেখিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আসলে গিয়েছিলাম সিনেমায়। মুনতাসীর গা থেকে নতুন শার্ট খুলে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছিল খালেদকে। এখন মুনতাসীরের শরীর ঢাকবার মত একটা শার্ট নেই। মনে মনে বললাম এমনিই হয়, হ্যাঁ এমনিই হয়।

কয়েকদিন পরে খুলনা থেকে এলেন মুনতাসীরের আব্বা। রুমে জিনিসপত্র ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। এ-পাশে ব্লক, ও-পাশে প্রুফ, এদিক সেদিক 'অতন্দ্রে'র কপি। বুড়ো দেখলেন সব। যত দেখলেন, শুনলেন তার চাইতে বেশি। অনেক আশা করতেন ছেলের ওপর। বুঝলেন সে আশায় ছাই পড়েছে। ছেলে তার নাস্তিক হয়ে গেছে। কেউ রুমে ছিলাম না। রুমমেট মুজতাহিদ সাহেব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু জানালেন। তিনি আর রুমে বসতে পারলেন না। তাঁর আল্লাহুতায়ালা নাস্তিক ছেলের রুম থেকে তাঁকে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। গেটের মুখে মুনতাসীরের সঙ্গে দেখা। ছেলের ভাঙাচোরা শরীরখানার দিকে চেয়ে তার পিতৃত্বের তন্ত্রীতে টান পড়ল। দু ফোঁটা অশ্রু জেগে উঠল চিকচিকিয়ে। পর মুহূর্তে ভাবলেন, এ ছেলে তাঁর নাস্তিক হয়ে গেছে। তিনি কঠিন হয়ে গেলেন, ফিরিয়ে নিলেন মুখ।

সেদিনই সন্ধেবেলা মুনতাসীর ট্রাঙ্ক, বই-পত্তর, লেপ, তোষক সব গুছিয়ে নিয়ে বলল

'চললাম জাফর।'

'কোথায়?' চমকে উঠলুম।

'আব্বা তো আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন। আমার মধ্যে তাঁর পরকালের বিশ্বাস মার খেয়েছে। তাঁর ইচ্ছাকে আমি জীবনে সফল করে তুলতে পারিনি। নিজের ইচ্ছের পথেই চলেছি আমি। এরপর থেকে তিনি আমাকে খরচ দেবেন না। দিলেও আমি নেব কেন? এক মুহূর্ত থামল। বোধ হয় চোখের জল সামলাবার জন্য। সে জানে কাঁদবার জন্য জন্ম হয়নি তার।

'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'একটা আস্তানা ভাড়া করেছি।'

'কোথায়?'

নবাবগঞ্জ বাজারের পেছনে। একেবারে বুড়ীগঙ্গার ধারে। উদাস আকাশ, অঢেল হাওয়া।'

'আর পায়খানা প্রস্রাব এবং মেছোহাটার গন্ধের কথা চেপে গেলে কেন?'

'সেসব তো কিনে নিলাম নিজে।' হাসল মুনতাসীর।

চলে গেল। আমার বুকটা চুর চুর করতে লাগল। ভেতরটা মরিচ লাগার মত জ্বলছে।

৪

আমাদের অনার্স পরীক্ষা এল। কোনদিকে নজর দেবার ফুরসত পাইনি। রুম থেকে বেরুইনি দু মাস। তিন বছরের পড়াশুনা দু মাসে তৈরি করে নেওয়া, যে কী কঠিন কাজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাত্রেই জানেন। পরীক্ষা শেষ হলে মনে হল, আবার নতুন করে জন্ম নিলাম। যে সার্টিফিকেটের জন্য এত তপস্যা, পদে পদে এত কষ্ট, কুইনিন মিকচারের মত এত লেকচার গেলা, আপাতত তার এক অধ্যায়ের ইতি হল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

এখনো মুনতাসীরকে দেখি। হাতে 'অতন্দ্র'। ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল রুখুসুকু। পরনের পাজামাটায় সাত পাঁচটা গেরো। মুখ দেখে মনে হয় হয়ত খাবার জোটেনি। দেখা হলে আলাপ করে, কথা বলে। এতটুকু সঙ্কোচ কিংবা জড়িমা নেই। বাইরের পোশাকটা যেন কিছু নয়, যেন ওটা তার ইচ্ছাকৃত ছদ্মবেশ, সে যেন ছদ্মবেশী রাজকুমার। চলতি সংখ্যা 'অতন্দ্রে'র সম্পাদকীয় পড়ে শোনায়। ছুরির মত ধারালো করে হাসে। তহুরার সঙ্গে কথা বলতেও দেখি কোন কোন দিন।

তাকে দেখলে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বেশ একটা হাসির সাড়া পড়ে যায়। কেন হাসে বলতে পারব না। হয়ত হি হি করে হেসে আমাদের মত অগভীর মানুষেরা এক ধরনের আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকি। যেমন করে শুষ্ক স্লোগান আওড়াই, ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ি, হিন্দি ছবি দেখি তেমনি করে আমরা হাসি।

তাই বলে মুনতাসীর বন্ধুহীন ছিল না। তার উজ্জ্বল হৃদয়ের উত্তাপে মানুষকে গলিয়ে আপন করে নিতে পারত। আমাদের হৃদয় ছিল না, তাই আমরা গলিনি। আমরা ছাড়াও তো মানুষ ছিল, মানুষের কাঁচা তাজা হৃদয় ছিল, সে হৃদয়ে উত্তাপ ছিল, আলো ছিল।

একদিন লুঙ্গি পরা একজন লোক এসে আমাকে খবর দিল, মুনতাসীরের অসুখ। লোকটির সঙ্গে যদি যাই, তা হলে খুশি হবে মুনতাসীর। তাকে খুশি করা কি সোজা কাজ? আমাদের লেখাপড়া জীবনধারা, চিন্তা-ভাবনা কিছুই খুশি করতে পারেনি বলেই তো, মুনতাসীর নবাবগঞ্জের মেছোহাটার একটি থিকথিকে খোপে রাত কাটাচ্ছে আর দিনভর বগলে 'অতন্দ্র' নিয়ে ঢাকা শহরের পথে পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে এক নজর দেখে যদি মুনতাসীর সুখী হতে চায় মন্দ কি! সঙ্গে রওনা দিলুম।

বাজারের মেছোহাটার কাছে ছোট্ট একখানা ঘর। পায়রার খোপের মত। কেরোসিন কাঠের তক্তপোষের ওপর মুনতাসীর শুয়ে আছে। দুজন মানুষ বসে

আছে শিয়রে। কাপড়ে চোপড়ে মনে হল তারাও বাজারের লোক। ছোট্ট একখানা টেবিল। সেও কেরোসিন কাঠের। তাতে প্রুফ। আর অষুধের শিশি বোতল ছড়ানো। আমাকে দেখে চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুনতাসীরের। বসলাম পাশে। কপালে হাত দিলাম। অল্প অল্প জ্বর আছে।

'কেমন আছ মুনতাসীর, জ্বর কখন থেকে?'

'ভাল এখন, জ্বর আজ পনের দিন।'

'জ্বর হয়েছে আজ পনের দিন, খবর দাওনি কেন?'

'খবর দিতে চেয়েছিলাম,' ও মহিলাটি বললেন, 'তোমাদের পরীক্ষা, তাই খবর দিয়ে বিরক্ত করতে চাইনি।'

ওমা, এতক্ষণ খেয়াল করিনি। ও-পাশে ছোট্ট মোড়ায় বসে প্রুফ কাটছে তহুরা। হ্যাঁ, তহুরাই তো। ভাল করে তাকালাম। সেও তাকাল আমার দিকে। আদাব দিল ছোট করে। জিজ্ঞেস করলাম :

'কেমন আছেন ভাল তো?'

'ভাল আর কোথায়? দেখছেন না আপনার বন্ধুটি কেমন উড়নচণ্ডীর মত ঘুরে অসুখ বাধিয়েছে। আমাকে 'অতন্দ্রে'র প্রুফ কাটতে হচ্ছে।' তহুরার দুচোখ বেয়ে গলে পড়ছে মমতার ধারা।

আমি সে মুহূর্তে মুনতাসীরকে ঈর্ষা করতে লাগলাম। মনের গভীরে একটা কালো রেখা জেগে উঠল। মুনতাসীর সৌভাগ্যবান। তহুরার মত একটি মেয়েকে সে আপনার করে পেয়েছে। হ্যাঁ, তহুরা মানুষ চিনেছে। এরকম লোককেই ভালবাসা যায়, এক ধাতুতে গড়া ব্লকের মত যার চরিত্র। আমার জীবনের অর্থহীনতা চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি আমাদের সকলের হাসির পাত্র মুনতাসীরকে হিংসা করতে লাগলাম।

মুনতাসীর বলল

'আমার জ্বর হওয়ায়, এ মাসে 'অতন্দ্র'টা ঠিক সময়ে বের হবে না।'

'রাখ তোমার 'অতন্দ্র,' আগে ভাল হও।'

'কোথায় রাখব জাফর। তেমন সংস্কারমুক্ত হৃদয় তো এ দেশে নেই। ওদের হৃদয়ে যদি রাখতে পারতাম।' শিয়রে বসা মানুষ দুজনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'কিন্তু ওরা বোঝে না। এ মহিলাটি দয়া করে কিছুদিন কাজ করছেন, তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।'

তহুরাকে দেখিয়ে দিল, তারপর বলল।

'সেও কতদিন জানিনে।'

তহুরার মুখে একটা কালো ছায়া নেমে আবার মিলিয়ে গেল। আবার মুনতাসীর বলতে শুরু করল।

'আদতে জানো কি জাফর, মানুষ খাঁটি ইচ্ছার ভার সইতে পারে না, তাই তারা পলায়নবাদী। একটা লক্ষ্যের পানে কামানের গোলার মত ছুটে যেতে

পারে না। জাফর তুমি তো রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে, সে গানটি গাওনা— 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো একলা চলো, একলা চলোরে... ।'

'হ হ গান কন দেহি এটু হুন্যা লৈ।' শিয়রে বসা লোক দুজন বলল।

সন্ধে হয়ে আসছে। আমার চলে আসার সময় হল। তহুরাকে জিজ্ঞেস করলুম

'যাবেন?'

'হ্যাঁ, যাব, পরের ফর্মার প্রুফটা দেখে অষুধটা খাইয়ে তারপর।'

'রাত হচ্ছে যে' বললাম আমি।

'সেজন্য ভাবনা নেই, রশীদ আমাকে পৌঁছে দেবে।'

শিয়রে বসা দুজনের একজন বলল

'বুবু আমার বইনেরে আনবার যাওন লাগবো। মা কইছে, আউয়াল মিয়া আপনেরে দিয়ে আসবো।'

'আচ্ছা'। বলল তহুরা।

সেদিন ফিরতি পথে বারবার রবীন্দ্রনাথের সে কবিতাটি মনে করতে চেষ্টা করছিলুম। ভুলে গেছি। রেশটা মনে দোল দিচ্ছে।

'সন্ন্যাসী হব না আমি, যদি না পাই সন্ন্যাসিনী।'

কিছুদিন পরে মুনতাসীরের খোঁজে গিয়ে দেখলাম, ঘর বন্ধ। বাজারের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা বলল, সে থাকে না আজকাল। কোথায় থাকে বলতে পারল না। সাদা আর কালো দুটি ইদুরের মত দিন রাত আয়ুর কোমল তরুটি কাটছে। অবিরাম কেটে যাচ্ছে। কত কিছু ঘটছে আমাদের চারদিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। নতুন আবেগে স্লোগান দিয়ে গলা শানিয়ে নিচ্ছে। জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির ফ্যাক্টরিতে নতুন নতুন স্লোগান তৈরি হচ্ছে। আমরা বিদায় নিচ্ছি। ফেলে যাচ্ছি মাতৃ আদরে জড়িয়ে ধরা আনন্দ বেদনা উদ্দীপনার স্মৃতি মাখানো বিশ্ববিদ্যালয়। অনেক কিছু ভুলছি, ভুলবার বেদনায় কেঁদে কেঁদে উঠছি। পৃথিবীর কার্যকারণের কঠিন শৃঙ্খলে জড়িয়ে যাচ্ছি। তবু মাঝে মাঝে কাঁটার মত ব্যথা দিয়ে মুনতাসীরের কথা মনে হয়। সঙ্গীতের মত বাজে কানে তার নাম। আলেয়ার মত জ্বলে চোখে তার দুঃসাহস। কোন কোন সন্ধেবেলা একা থাকলে তার প্রিয় নক্ষত্রটির দিকে চোখ পড়ে। অমনি তার কথা মনে পড়ে যায়। মুনতাসীর এখন কোথায়? কী করে? 'অতন্দ্র' কি বের হয় না? খবর রাখিনে। এমএ পাস করে সংবাদপত্রে চাকরি নিয়েছি। আমার খবর আসে টেলিপ্রিন্টারের তারে।

সেদিন অফিসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের গুণ্ডামির ওপর একখানা রিপোর্ট লিখছি, মনে পড়ে গেল মুনতাসীরের নাম। মুনতাসীর একবার এক এ গুণ্ডামির প্রতিবাদ করেছিল। আরেক মুনতাসীর কখন জন্মাবে? আমিও মুনতাসীরের

সঙ্গে ছিলাম। আমার জীবনের সেটিই একমাত্র বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনা। চৌকোণা হীরক খণ্ডের মত আমৃত্যু আলো বিকিরণ করবে। কিন্তু মুনতাসীর কোথায়? কোথায় সে প্রতিবাদের প্রজ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ। কালের ধূলির তলায় চাপা পড়ল কী? খবর রাখিনে, খবর রাখিনে, আমার খবর আসে টেলিপ্রিন্টারের তারে।

এমন সময় আমার টেলিফোন তরুণ বজ্রের মত চিৎকার করতে লাগল। রিসিভার কানে লাগিয়ে বললুম

'হ্যালো কে?'

'জাফর সাহেব আছেন?' ওপাশে নারীকণ্ঠ!

'জ্বি বলছি, আপনি?'

'আমার নাম তহুরা বেগম, বোধহয় চিনবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আদাব, কেমন আছেন? কোত্থেকে বলছেন?'

'আছি একরকম, বলছি মতিঝিলের বাসা থেকে। আপনার বন্ধুর কোন খবর জানেন?'

'মুনতাসীর? তার কথা এই একটু আগেই ভেবেছি। কোথায় থাকে, কী করে কিছু জানিনে। সেই যে নওয়াবগঞ্জ বাজারে দেখা তারপরে আর কিছু জানিনে, পরে দুবার গিয়েছিলুম, কোথায় নাকি চলে গেছে।'

তহুরা বলল :

'কতবার নওয়াবগঞ্জ বাজারের বাসায় গেছি, পাইনি। কোথায় গেছে কিছু বলতে পারিনে। ঐ যে আউয়াল আর রশীদকে দেখেছিলেন, ওদেরকে দিয়ে কত জায়গায় খোঁজ করিয়েছি।'

আমি হঠাৎ কথা বলতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম :

'কী করব বলুন।'

'না, না, আপনাকে কিছু করতে হবে না, আমাকে...আমাকে...।' কান্না ভেজাস্বর ভেসে এল, রেখে দিলুম।

তার বেশ কিছুদিন পরে। একখানা ট্রাক অ্যাকসিডেন্টের রিপোর্ট নিতে আমাকে ডেমরা যেতে হয়েছিল। কী আর রিপোর্ট নেব। পাঁচজনের শরীর থেঁতলেছে। এ আর এমন বেশি কি। মানুষ তো মরছে হরদম। বেবি ট্যাক্সিতে উঠতেই চোখাচোখি। পয়লা চিনতে পারিনি। গায়ে তেল কালির দাগ। চুলগুলো বেতের ফেশোর মত। কিন্তু মুখের হাসিটি এখনো অবিকল তেমনি আছে।

'মুনতাসীর।'

'চিনতে পেরেছেন?' হাসল অনাবিল সে হাসি। একটুও অভিযোগ নেই। তেমনি আছে রাজকুমার। আমাকে দেখে জড়িয়ে ধরল না। সম্ভবত অন্যান্য শ্রমিকদের মত সেও বুঝে গেছে, আমাদের মত ভদ্রলোকদের মধ্যে জড়িয়ে ধরবার মত কিছু নেই।

'এখানে কোথায় আছ।'

'এখানে নয় ওখানে' উঁচু উঁচু চিমনী দিয়ে ধোঁয়া ছড়ানো চটকলটা দেখিয়ে দিল। 'আর আছি এদের সঙ্গে।'

পেছনে গায়ে তেল কালি মাখা ঘর্মাক্ত কলেবরের এক ঝাঁক মানুষ দেখিয়ে দিল। চটকলে ছুটির ঘণ্টা পড়ছে। পিল পিল করে কালো পিঁপড়ের মত মিলের উদর থেকে তেল কালি মাখা, গায়ে ঘাম ঝরা মানুষের ঝাঁক বেরিয়ে আসছে।

'খুব আশ্চর্য হচ্ছো, না।' হাসল চিকন চিকন দাঁত দেখিয়ে। তার হাসিটি এখনো জুঁই ফুলের মত সুন্দর।

'বাইরেরটা দেখলে শিউরে উঠবে। আমিও প্রথম প্রথম উঠেছিলাম। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। অশিক্ষিত, অমার্জিত। রুচি সংস্কৃতির বালাই নেই। কাজের শেষে তাড়ি খেয়ে এ ওর মাথা ফাটায়। এর মাকে ও গালাগাল দেয়। খুনোখুনি করে। সারারাত বেঘোরে পথে ঘাটে অথবা ঝুপড়ি ঘরে রাত কাটায়। সপ্তাহ অন্তে টাকা পেলে নারায়ণগঞ্জের টানবাজারে বেশ্যার ঘরে গিয়ে নগদ পয়সা দিয়ে প্রেম কেনে। আরো কত কিছু করে। তবু ওরা খারাপকে খারাপ বলে, ভালকে বলে ভাল। সেজন্য জান যায় যাক কুচ পরোয়া নেই।'

আমার আশ্চর্য হওয়ার শক্তিও লোপ পেয়ে গেছে, একি সেই মুনতাসীর! যে দু চোখ দিয়ে নক্ষত্রের সঙ্গে কথা বলত, স্বপ্নের মধ্যে পথ চলত। তার বাসায় যাবার জন্য একসঙ্গে শীতলক্ষ্যা পার হয়ে এলাম। নদীর চরে পা দিয়ে জানতে চাইলুম 'কেমন লাগছে মুনতাসীর?'

'ম্যাকসিম গোর্কির মত।' জবাব দিল।

'কোন্ গোর্কি?'

'যার জন্ম শতবার্ষিকীতে সংবাদপত্রের পুরো এক পৃষ্ঠা ছাপা একখানা প্রবন্ধ লিখেছিলে।' কৌতুকে তার চোখ দুটো নেচে উঠল।

বললাম আমি

'সংবাদপত্রে চাকরি করি, প্রবন্ধ লেখাই পেশা। সবকিছুর ওপর লিখতে হয়।'

'যদি উপরঅলার আদেশ হয় তা হলে।' আমার মুখের কথা টেনে নিয়ে বলল।

বেশ কিছুদিন আগে, তহুরা আমাকে টেলিফোন করে তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেল। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল। হঠাৎ আমাকে বলল

'জাফর আমার একটা অনুরোধ রাখবে?' বড় করুণ শোনাল তার কণ্ঠস্বর।

'কী?'

'আর কোনদিন যদি তহুরা আমার খবর জিজ্ঞেস করে কিছু বলবে না।'

'কেন?'

'তা হলে বেচারি ভারি কষ্ট পাবে। আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ করত। শেষমেশ আমি নাকি হয়ে গেলুম একটা চটকলের শ্রমিক।'

'তিনি তো তোমার সঙ্গে নওয়াবগঞ্জের বাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ, অতটুকু গিয়েছিল। কিন্তু ডেমরা আসতে পারে না। দেখছো না কি বেআব্রু জীবন। আর মানুষের হৃদয়ও কয়দিন বাঁচে। কি বল, ওকে আমার জীবনের সঙ্গে না জড়িয়ে ভাল করিনি!'

কথা না বাড়িয়ে তার বাসায় গেলাম। তার বউবাজারে ছোট্ট একখানা বেড়ার ঘর। সাজসরঞ্জাম বিশেষ কিছু নেই। মাদুর, বালিশ, মশারি, হাতপাখা ইত্যাদি। আর রান্নাবান্না করার দু-চারটে হাঁড়ি পাতিল। একটা খাতা বের করে দেখাল সে লিখছে কিছু আজকাল। আট-দশ পাতা পড়ে রেখে দিলাম। আমরা শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা সকলেই তোষামোদের জগতের বাসিন্দা। আমরা যা পড়ি, তোষামোদ, যা লিখি তাই তোষামোদ, ওতে শক্ত কিছু ঘন কিছু গভীর কিছু নেই। সেজন্য আমাদের স্নায়ুগুলোও ভারি দুর্বল, ফুলের ভার সইতে পারে না।

মুনতাসীর লিখেছে জীবনের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা। জীবন ক্ষয় হচ্ছে চোখের সামনে। উলঙ্গ অভাব জীবনের বোঁটা ধরে টানাটানি করছে। হতাশা কালো ভালুকের থাবার মত চেপে ধরছে। চোখের সামনে মালিক শ্রম চুরি করছে। সবকিছুর বিরুদ্ধে জীবন মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে জাগছে। কী তার জিঘাংসা, কী তীব্র দুঃখ, আঘাতে হিমালয়ও বুঝি ধসে পড়বে। কালো ঘর্মসিক্ত মানুষের মনের পাথুরে কয়লার নাহান আগুন সহ্য করার মত স্নায়ু আমার নয়। অনুভব করলাম, আমি একজন সাংবাদিক। শুধু সংবাদ লেখাই আমার পেশা। সত্য-মিথ্যে সকল রকমের সংবাদ। মুনতাসীরের কথা চিন্তা করতে করতে ফিরে এলাম।

বছরখানেক পরে হবে। একটা রাজনৈতিক সভার রিপোর্ট লিখছি। বেলা বোধহয় সাড়ে চারটে কি পাঁচটা হবে। টেলিফোনে কে আমাকে ডাকল। আজকাল আর কর্কশ স্বর সইতে পারিনে। মসৃণ মানুষের সঙ্গে থেকে নিজেও তেলাল রুচির মানুষ হয়ে উঠেছি। ওপাশের লোকটিকে যদি হাতের কাছে পেতাম কসে দুটি চড় বসিয়ে দিতাম। যেন একটা কাক টেলিফোনের অপর প্রান্তে কা কা করছে। তবু শুনতে হল। বলছে ডেমরা থেকে একজন শ্রমিক। মুনতাসীরের নাকি ভয়ংকর অসুখ। বাঁচবে না। আমাকে দেখতে চাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে স্কুটার নিয়ে ছুটলাম। সন্ধের আগে আগে ডেমরা গিয়ে পৌঁছুলাম। শীতলক্ষ্যা পার হয়ে মুনতাসীরের ছোট বাসাটিতে যেতে সন্ধে হয়ে গেল।

মুনতাসীর শুয়ে আছে বাঁকা হয়ে। দুর্দান্ত টিটেনাস রোগের সঙ্গে প্রাণপণ সংগ্রাম করছে। শরীরের ভেতর যেন সাইক্লোন প্রবাহিত হচ্ছে আর ধুনকের মত বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সারা শরীর। পাণ্ডুর মুখমণ্ডলে জুঁই চামেলী ফুলের মত সুন্দর হাসিটি এখনো ধরে রেখেছে। গলায় ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে। হায়রে মুনতাসীর, এই তোমার পরিণতি। বিশ-পঁচিশ জন শ্রমিক মুনতাসীরের বিছানার চারদিকে বসে আছে গোল হয়ে। সকলের চোখ ছল ছল করছে। কারো মুখে রা নেই। ওদেরকে মুনতাসীর প্রখর হৃদয়ের উত্তাপে গলিয়ে আপন করে নিয়েছে। কোন রকমের চোখের জল চেপে পাশটিতে গিয়ে বসলাম। কপালে রাখলাম ডান হাত। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকল আমাকে

কথা জড়িয়ে যাচ্ছে মুখে। প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে আসছে জীবনের জীবনী রস। সন্ধে নামছে। আকাশে কুয়াশা লেপ্টে ধরেছে। আবার ডাকল।

'জা-ফ-র।'

চেরাগ বাতির মিটমিটে আলোর মত দৃষ্টি, দীপের শিখা কম্পন। যে-কোন মুহূর্তে নিভে যেতে পারে। আকাশে কুয়াশা। কুয়াশার শিয়রে হীরকের মত প্রতিভা এলানো তার প্রিয় নক্ষত্রটি কাঁপছে। ধীরে ধীরে একটি আঙুল তুলে ধরল। আঙুলটিও কাঁপছে।

'জা-ফ-র, নক্ষত্রের চোখে জল কেন?'

আমি চেয়ে দেখলাম কুয়াশা। আবার বলল!

'জাফর নক্ষত্রের চোখ বেয়ে লাল লাল জল ঝরছে। আমার বুকেও তেমনি লাল লাল জল ঝরেছে। আহ্ একটিবার আমি বলতে পারিনি, আমি তোমাকে ভালবাসি তহুরা। প্রেমের চেয়ে জীবনকে দামি মনে করেছিলাম। সে জীবনকে খুঁজলাম— পেয়েছি। তহুরা ছিল আমার, প্রাণ আমার। একবার একটা কবিতা লিখে দিয়েছিল :

'পৃথিবীর সুর আমি পৃথিবীতে বাস করি
সবকিছু ছুঁয়ে ছুঁয়ে গতিময় করি।'

আমাকেও ছুয়েছো তহুরা। আমার পাখায় লেগেছে গতি। আমি পেরিয়ে যাচ্ছি, জীবনের সীমানা পেরিয়ে যাচ্ছি। কোথায়? অন্ধকার-অকুল অন্ধকার। জাফর নক্ষত্রের চোখে জল, আমার বুকে জল, লাল লাল জল।'

আবার কথা বলতে চেষ্টা করল। শরীরে খিল ধরেছে। হাত পা কুঁকড়ে আসছে। সমস্ত শরীরে মোচড় খেলছে। বারবার মুখ খুলতে চেষ্টা করে পারে না। জীবন প্রদীপ নিভছে। জীবনী রস অ্যাসিডের মত উড়ছে। একটি ফুল বোঁটা থেকে ঝরছে। বাতাসে পাপড়িগুলো কাঁপছে। প্রাণপণ শক্তিতে মুখ খুলল মুনতাসীর।

'জা-ফ-র, তহুরাকে আমাকে ক্ষমা করতে বলবে। আর লেখা খাতা দুটো তাকে—'

একটা হিক্কে উঠল। তারপরে সব শেষ। নিশুতি নিশুতি।

গন্তব্য

রুস্তম আলী জাগল। পাহাড়ের ঢালুতে বোচকা শিথান দিয়ে ঘুমিয়েছিল। সে কারণে ঘাড়ের পেছনে ব্যথা নেমেছে। পা দুটো ভেড়াতে পারে না। ব্যথায় পাকা ফোড়ার মতন টন টন করে। সমস্ত রগগুলো কুঁকড়ে এসেছে। একটা রাত একটা দিন অবিরাম হেঁটেছে। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভাঙতে ভাঙতে অবশ হয়ে গেছে রুস্তম আলীর ক্ষিপ্র একজোড়া পা। জলের তেষ্টায় বুক জ্বলছে। পেটের বত্রিশ নাড়ির ভেতরে কাঁদছে পাহাড়ি ক্ষুধা। ঠিকেদারের স্টোর থেকে চুরি করে আনা চিঁড়ের পুঁটুলিটা খুঁজে দেখল। নেই। গামছার এক গিঁটে চিঁড়ে আরেক গিঁটেতে ছিল জিন্নাহ মার্কা নোটের বান্ডিল। পালিয়ে আসার দিন সন্ধেবেলা ঠিকেদার জুমাখানের আলখেল্লার মত সার্টটার পকেট থেকে কায়দা করে দুই আঙুলে তুলে নিয়েছিল। বেজন্মার বাচ্চারা তার জন্যে কিচ্ছু রেখে যায়নি। রুস্তম আলীর কাঁদতে ইচ্ছে হল। টাকার চাইতে চিঁড়ের শোকটা প্রবল হয়ে বাজছে বুকে।

ক্ষুধার কথা ভুলে গেল। তেষ্টাটা শুধু বুকের ভেতর ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলতে থাকল। কিচ্ছু করার নেই রুস্তম আলীর। কনুয়ের ওপর গাল রেখে পশ্চিমদিকে থির থির চোখে তাকিয়ে রইল। চৈত্রের মরা পাহাড় শুয়ে আছে শান্ত হাতির বাচ্চার মত। ছাতার সমান বড় হারগেজা পাতা ঝরছে। বাতাসে বেজে উঠছে বনের মর্মর ধ্বনি। রুস্তম আলীর মনে হল শিলায় শিলায় আঘাত খেয়ে বাতাস বুঝি কাঁদছে। আকাশের ললাটে দিনান্তের চিতা। ধুমল পাহাড়টার শিয়রে সটান সুঠাম গর্জনটার মাথার উপর সূর্য ডুবছে। ছটা লেগে চিকন বাঁকা পাহাড়ি পথটা হরিণের মাংসের মত লাল দেখাচ্ছে। হঠাৎ রুস্তম আলীর মনে হল, বাঁদিকের পাতাহীন সিন্দুল গাছটির মত সে একা। একা আর অসহায়। বুকটা হু হু করে উঠল।

আগের দিন ভাতঘুমের রাতে লুসাই পাহাড়ের গোড়া থেকে তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে মেলা করেছে রুস্তম আলী। বনের মানুষ খেকো বাঘের চাইতেও বেরহম পাঞ্জাবি ঠিকেদার জুমাখানের রিজার্ভড ফরেস্টের পাহাড় কাটা কুলির বাথান থেকে তিন তিনজন মানুষকে নিয়ে পালিয়ে আসছিল। কুমিল্লার কাদের বকসু, সন্দ্বীপের আউয়াল আর নোয়াখালীর হামদু মিয়া। বাঘ মরবার শখ হলে যেমন গাঁয়ে গিয়ে মানুষ মারে, কুলিকামিনদেরও তেমনি মরতে শখ হলে

রিজার্ভড ফরেস্টে এসে হাতে গাঁইতি তুলে নেয়, কোদাল ধরে। জানটা কোন রকমে বেঁচে যায়। গতরের বলবীর্য শুষে নেয় কঠিন নীরস পাহাড়। সৃষ্টির সকাল থেকে যে পাহাড় মানুষের বলবীর্য সাধ্যি সাধনাকে নীরবে ব্যঙ্গ করে এসেছে, কেন নিজের ওপর দিয়ে ঠিকেদারের আট চাকার ল্যান্ডরোভার চলার পথ দেবে? সময় বিশেষে কাঁচা তাজা জানের ওপরও হামলা যে করে না এমন নয়। হাজারে হাজারে কুলির মধ্যে দু চার দশজন মারা যায়। ও কিচ্ছু না।

পালিয়ে আসার নামে চমকে উঠেছিল তিনজন। রিজার্ভড ফরেস্ট থেকে পালাতে গিয়ে একজন কুলি শের আফজাল খানের গুলি খেয়ে মরেছে। অন্য কুলিরা যাতে ওরকম দুঃসাহস না করে সেজন্য নিহত কুলির মাথার খুলিটা নাকি শের আফজাল খান সাইডে যাওয়া আসার পথের পাশে গাছের সঙ্গে লটকে রেখেছিল। থানাহীন, পুলিশহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন, দুর্গম অরণ্যে জানের ঝুঁকি নিয়ে কেউ পালাতে সাহস করে না। সারারাত পাহারা দেয় ঠিকেদারের লোক। পালাবার দিকে তাই কুলিদের মাথা খেলে না। তার চেয়ে ভাল আল্লাহর ওপর ভরসা করা। বছরে ছয় মাসে যদি কোনদিন সাইট কিলিয়ার হয়, আল্লাহ বউ বেটার কাছে ফিরিয়ে নেবে। রিজার্ভড ফরেস্টে আল্লাহর ইচ্ছেতে সবকিছু হয়। ভুলিয়েভালিয়ে কুলি নিয়ে আসা থেকে বলবীর্য শুষে নেওয়া পর্যন্ত সবটুকু। কেবল নিজের ইচ্ছেতে ঠিকেদার লাখ লাখ টাকা বানায়। এমন কঠিন ইচ্ছে...তার শৃঙ্খল ছিন্ন করার মত মনোবল নিঃশেষিত শক্তির কুলিদের নেই। তবে রুস্তম আলীর কথা আলাদা।

জোড়া খুনের ফেরারি আসামি রুস্তম আলী বিলাইছড়ি, খাগড়াছড়ির মগ মুরুংয়ের পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাঘুরি করছিল পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে। বিলাইছড়ির বাজারের পূর্বদিকের মুরুং পাড়ায় মদের আসরে জুমা খানের সঙ্গে পরিচয়। নেশার ঘোরেও কাজের মানুষ চিনতে ভুল করেননি খান সাব। অনেকদিন থেকেই এমনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির একজন মানুষের খোঁজে ছিল। হাতের সুখ মিটিয়ে কুলিদের কেরেক বেত দিয়ে বেতিয়ে কড়ায় গণ্ডায় কাজ আদায় করে ছাড়বে।

চলে এল রুস্তম আলী ঠিকেদার জুমাখানের কুলির বাথানে। স্বেচ্ছাচারী ডাকাতের নির্ভাবনায় লুকিয়ে থাকবার উপযুক্ত জায়গা বটে। পয়লা বেশ লাগছিল। সাপের মত পেটাও। পিটিয়ে গায়ের ঝাল ঝেড়ে ফেল। কেউ রা টি করবে না। পিঠের ছাল কেটে গিয়ে রক্ত আসুক। বোবা চোখ মেলে চেয়ে থাকবে নিথরে। কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠছে রুস্তম আলী। জন্মাবধি সে ডাকাত। নিত্যনতুন ডাকাতি করা তার পেশা। ডাকাতি মানেই তো সাহস, বুদ্ধি, শক্তি এবং নিখুঁত পরিকল্পনার অপূর্ব সমন্বয়। রাতেরবেলা গেরোস্তের ঘরে চড়াও হয়ে মেরে কেটে তছনছ কর। তেড়িমেড়ি করে তো এক কোপে কালো মাথাটা ঘিরিয়ে দাও জমিনে। টাকাকড়ির সন্ধান

না দিলে আগুন জ্বেলে সেঁকো সেঁকতে থাক। এরই নাম তো জিন্দেগানি। হিম্মত কর, মাথা খাটাও। অপরের মূল্যবান সঞ্চয় ছিনিয়ে নাও জোর করে।

মনখানা বেঁকে যায় রুস্তম আলীর। অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করে। বুকের সাহস বুকের খাপে তরবারির মত ঝিকিয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ সুঁচের মত বুদ্ধি মাথার খুলির ভেতর কিলবিল করে পোকার মত। এ দুনিয়াতে ডাকাতের চাইতেও বড় ডাকাত আছে। গোটা জেলায় এক নামে পরিচিত ডাকাত রুস্তম আলী, যার নামে গায়ের লোম খসে যেত তরাসে, সে কিনা একশ টাকা মাস মাইনের কুলি হয়ে গেল। একে বলে কপাল। তার চাইতে ফাঁসিতে ঝোলা যে অনেক ভাল। কেড়ে নেওয়া যার পেশা, খুনে যার আনন্দ, নিরাপত্তার জন্য সে কিনা ঠিকেদারের দাসত্ব করে। রাতেরবেলা ঘুমুতে পারে না। লুসাই পাহাড়টা বুকের ওপর চেপে বসে।

তাই বলে বেকুব নয় রুস্তম আলী। মাথার সব বুদ্ধি এখনো পচে যায়নি। ধৈর্য আছে তার। ঝিনুকের মুখে যেমন অষুধ গেলানো হয়, তেমনি করে পাহাড়ি নদীর মত বেগবান ক্ষিপ্ত ইচ্ছের দ্বারা একটু একটু করে পান করিয়ে তিনজন আধমরা মানুষকে ক্রমে চাঙ্গা করে তুলেছে। ওতে তার একমাস সময় লেগেছে। তা লাগুক। কিন্তু বিফল হয়নি রুস্তম আলীর ঝিম মারা প্রতীক্ষা। অবশেষে চারজনে যুক্তি করে রাতের অন্ধকারে সমতল ভূমির উদ্দেশে পথে নেমেছে। তার আগে ঠিকেদারের পকেট থেকে নোটের বান্ডিলটা হাতিয়ে নিয়েছে।

একবারও পেছনে তাকায়নি। পেছন মানে ভয়, পেছন মানে মৃত্যু। দুর্গম পাহাড়ি পথ। অবিরাম চড়াই উৎরাই ভেঙে সামনে চলেছে। কোথায় চলেছে এ চিন্তা রুস্তম আলীর মন ফুঁড়ে জেগেছে কয়েকবার। কোথায় যাচ্ছে সে? তার মত ইচ্ছেসর্বস্ব ডাকাতের বেঁচে থাকবার মত স্থান আইনকানুনের অধিকারী মানুষের পৃথিবীতে কই। তার জন্য অপেক্ষা করছে পুলিশ। তাকে ধরার জন্য গভরমেন্ট পুরস্কার ঘোষণা করেছে। চোখের সামনে ফাঁসির দড়িতে ঝুলন্ত একটা মানুষের ছবি বারবার ভেসে উঠেছে। আর বুকের তলাটাতে প্রচণ্ড মোচড়ানো ছুটেছে। পা দুটো হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। তবু, তবু, তবু রুস্তম আলী সাথীদের সঙ্গে তাল রেখে সমানে হেঁটেছে। এরি মধ্যে পাহাড়ের পাথর চোঁয়া পানি খেয়ে জন্মানো তরুণ শূল বেদনাটা তাকে কাবু করে ফেলেছে। এক ঝাঁক ধারালো হুলের মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সমস্ত উদরদেশ রক্তাক্ত করে তুলেছে। সে কিন্তু নিজের দুর্বলতার কথা সঙ্গীদেরকে জানাতে পারেনি। জীবনে কাউকে দুঃখের ভাগ দেয়নি রুস্তম আলী। পেট টিপে হাঁটছিল। শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিল। নিজের অক্ষমতার কথা মুখ ফুটে বলতে পারবে না। যেখানে শক্তি ফুরোবে, সেখানেই বসে পড়বে। নিজের প্রচণ্ড ইচ্ছেশক্তির তোড়ে তিনজন আধমরা কুলিকে পাঞ্জাবি ঠিকেদারের আওতা থেকে ছুটিয়ে নিয়ে আসতে

পেরেছে এ পর্যন্ত এবং তারা তার ইচ্ছে নির্দেশিত পথে হেঁটে হেঁটে বউ বেটার কাছে ফেরত যাবে, এটুকুই রুস্তম আলীর সান্ত্বনা। স্বেচ্ছাচারী ডাকাত রুস্তম আলী, লাভ, লোভ কিংবা নিরাপত্তার নিগড়ে আপন ইচ্ছে শক্তিকে বেঁধে রাখেনি।

তিনকোণাতে যখন এল, পাহাড়ি পথ অতিক্রম করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। সুচিমুখো বেদনার তীক্ষ্ণ শরে বিদ্ধ চেতনায় সমস্ত গিঁট খুলে খুলে আসছিল, পা টলছিল, শরীর কাঁপছিল। সে বসে পড়ল। কাপড়ের বোচকাটা মাথার নিচে দিয়ে পাহাড়ের ঢালুতে কাত হয়ে পড়ল। তার আগে হামদু মিয়াকে বলল

—হামদু ভাই, তোমরা যাও। বেলাবেলি বিলাইছড়ি পৌঁছানো চাই, আমি আর পারলাম না। ঠিকেদারের মানুষ যদি আসে আমি রইলাম।'

তখন সূর্য থির, আকাশ থেকে আগুন ঝরছিল। তারপরে রুস্তম আলীর আর কিছু জানা নেই। পয়লা ক্লান্তি, তার পরে সারা শরীর অসার করে দুচোখে নেমেছিল মরার মত ঘুম। জেগে দেখে সূর্য ডুবছে। পাহাড়ের শিয়র থেকে, বনের ভেতর থেকে, গাছের পাতার অজস্র ফাঁক থেকে ধারায় ধারায় কালো অন্ধকার নেমে আসছে, বুকে কান্না চাপছে। অর্থহীন— কে শুনবে? নিজেকে শুনিয়েই বলল সে—

—'তোর মত বেজন্মা হিম্মতদার মানুষের জন্য ডুবন্ত সূর্যের রক্ত আর কিচ্ছু নেই। ও পান করেই তোকে বেঁচে থাকতে হবে।'

তারপরে রুস্তম আলী দুচোখ দিয়ে সূর্যের রক্তই পান করতে লাগল।

রাত এল। আকাশের সরোবরে সোনালি পদ্মের মত ফুটল চাঁদ, ফুটল তারা। পাতার ফাঁক দিয়ে এলিয়ে পড়েছে মিহি চাঁদের আলো। পাহাড়টাকে তিনদিক দিয়ে জড়িয়ে ধরা ঘুমন্ত অজগরের মত খালটির কালো জলে আলো এসে পড়েছে। শান্ত অজগর যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জোছনা জোছনা স্বপ্ন দেখছে, সোনালি সোনালি নিশ্বাস ছাড়ছে। সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফেরারি আসামি রুস্তম আলীর দুচোখ ভরে গেল। আঃ শান্তি, শান্তি। চাঁদের ধারার মত বুকের গভীরে দোলা লেগে শেতল শেতল জোয়ার দুলছে। এক ঝাঁক রাঙা স্মৃতির কণা এক ঝাঁক রাঙা শৈলের পোনার মত মনের অতল থেকে হুস করে ভেসে উঠল। রুস্তমের দৃষ্টি থেকে পাহাড় হারিয়ে গেল, মুছে গেল বন, চাঁদের রাঙা ননীর প্লাবন পেরিয়ে এ কোন দেশে এল রুস্তম আলী?

সেবার বাঘখালী নদীতে নাও বেয়ে রামু থানাতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল। গোটা একটি মাস লেগেছে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে। নাও যোগাড় কর, দল গড়, পিস্তল বন্দুক সংগ্রহ কর। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘনিয়ে এসেছে আসল অভিযানের দিন। শুক্কুরবার রাতে গেরোস্তের ঘরে উঠে দুটো ফাঁকা আওয়াজ করে বড় ছেলের পা বেঁধে ফেলতেই বাড়ির বুড়ো কেঁদে কেঁদে বলল—

—'বা'জান, আমার যা আছে দেখিয়ে দিচ্ছি। বেইজ্জত করিসনি গায়ে হাত দিয়ে, সাত পুরুষের খান্দান।'

তারপর সত্যি সত্যি টাকা-পয়সা অলংকারপাতি যা ছিল ডাকাত দলের হাতে তুলে দিয়েছিল। মাছের কাঁটার ব্যথার মত রুস্তম আলীর ভেতরটা হিড়হিড় করছিল। সঙ্গীদের প্রতি ভয়ংকর আক্রোশ জাগছিল। মনের ভেতরে কে একজন যেন বলছিল: এভাবে কিছু নেওয়ার মধ্যে গৌরব নেই, মহত্ত্ব নেই। যে না চাইতে হাতের কাছে সব কিছু তুলে ধরে তার বাড়িতে ডাকাতি করার জন্য এত সাধ্যিসাধনা, এত লোকজন যোগাড়? রুস্তম আলীর লজ্জা লাগছিল। তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য কিছু একটা করা চাই, যাতে অল্প হলেও সাহসের পরিচয় থাকে। ওরা টাকা-পয়সা গয়না নিয়ে বলেছিল চল। সে কিন্তু এমনিতে চলে আসতে পারেনি। যে খান্দানের জন্যে টাকা-পয়সা অম্লান বদনে ডাকাত দলের হাতে তুলে দিল, সে খান্দানকেই কাঁধে নিয়ে পথ দিল। তার মনে হল, সে সত্যিকারের একটা কাজ করেছে। ডাঙ্গর মেয়ে মানুষটা কাঁধের ওপর কলার ডগার মত কাঁপছে। বিলের মধ্যে যখন এল, দলের বুড়ো মতি দেখে বলল—

—'আরে শালা রুস্তম্যা করস কি। মাইয়া মানুষ, দলে অলক্ষ্মী ঢুকব। ফেইল্যাদে, ফেইল্যাদে।'

বুড়ো মতির কথা মত রুস্তম আলী ধু ধু বিলের মধ্যে মেয়ে মানুষটিকে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু তার আগে দুহাত বাড়িয়ে অন্তরের সমস্ত আবেগ দিয়ে একবার সে জড়িয়ে ধরেছিল। খাকি শার্ট ছিল গায়ে, তবু মেয়েটির কোমল স্তনের পরশ তার শরীরে হলপল হলপল করে প্রবেশ করেছিল। জীবনে কত মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনদিন তেমন অনুভব করেনি। এখনো অস্থি মজ্জায় বুঝি স্পর্শ কাঁপে। শালার এ জীবনের যেদিকেই কান রাখি খালি আওয়াজ আসে, মনে মনে বলল রুস্তম আলী। দূরশ্রুত আওয়াজের মধ্যেই কান পেতে রইল অনেকক্ষণ।

অগ্নিকোণে কড় কড় করে একটা বাজ পড়ল। স্মৃতিরা সব মাকড়সার জালের নাহান কোথায় হারিয়ে গেল। বাঁকা বিদ্যুতের আগুন ঝিকঝিক করে জ্বলে উঠল। পূর্ব-দক্ষিণ কোণ থেকে ছুটে আসছে মেঘ, শিং উঁচানো হাজারে হাজারে কালো কালো মোষের মত। আরেকবার বাজ পড়ল। আরেকবার বিজলি চমকালো। চাঁদের আলোতে স্বপ্ন দেখা পাহাড়গুলোর চুড়ো কালো কালো দৈত্যের মাথার মত দেখা যাচ্ছে। আঁধার থমথমে হয়ে জমেছে জমাট বাঁধা কালো রক্তের মত। রুস্তম আলীর মনে হল ভুতুড়ে পাহাড়গুলো জোড়াখুনের আসামিকে গেরেফতার করার জন্য হাতকড়ি হাতে এগিয়ে আসছে। করুণ, অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল। চাঁদ, তারা, আকাশ, সোনা মাখানো খালের জল এখন সব স্মৃতিতে পরিণত। নিজেকে সম্বোধন করেই বলল—

—'সময় হয়েছে রুস্তম এবার তোর আসল পরীক্ষার পালা। তৈরি হ, আরেকটা সাহসের খেল দেখাতে হবে। বীভৎস মরণের মুখে ভেড়ার মত গলা বাড়িয়ে দিসনে যেন

বোচকাটা হাতে উঠিয়ে দাঁড়াল। সে ব্যথাটাও আঁকশির মত তার হৃৎপিণ্ড আকর্ষণ করে হেঁচকা টান দিতে আরম্ভ করেছে। দুহাত মুঠিবদ্ধ করে পাহাড়ের গা বেয়ে ঢালুর দিকে হাঁটতে থাকে। থমথমে আঁধার। কিচ্ছু দেখা যায় না। বুকের কোথায় আলো জ্বলছে। সে আলোকে পথ দেখে নিশীথে পাওয়া মানুষের মত রুস্তম আলী চলছে। কিছুদূর গিয়ে পাথরে ঠোক্কর খেল। 'মাগো, মা,' অস্ফুটে চিৎকার করল। একটা নখ উল্টে গেছে। হাত দিয়ে দেখে ভেজা রক্ত ছুটছে। দুহাত মুঠিবদ্ধ করে পাহাড়কে অভিশাপ দিতে থাকে।

—'আমার রক্ত নিলি হারামজাদি। সবুর কর, গাঁইতি-শাবল হাতে আসছে মানুষ। তোর গতরে লোভী মানুষের নজর পড়েছে। পাথুরে মাংস খুবলে খুবলে নেবে।'

রক্ত ঝরছে ঝরুক। সমস্ত শক্তি সংহত করে সে নিচের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। মজ্জায় মজ্জায় মর্মরিত ব্যথা। দম ফেটে রক্ত এল বুঝি। কেরেক বেতের ঝোপের ভেতর গিয়ে পড়ল। বেতের শাখার নির্দয় দংশনে ছড়ে গেল তার শীর্ণ শরীর। হাত পায়ে নালিশ উঠছে মোচড় দিয়ে। কিন্তু তাকে যেতেই হবে—অনেক দূর যেতে হবে। বিলাইছড়ি বাজারে না পৌঁছানো পর্যন্ত শান্তি নেই। এভাবে যদি পড়ে থাকে, সারা জীবনের কঠোর সাধনায় যে সাহস সঞ্চয় করেছে, কোন কাজে আসবে না। আকাশের বিজলির সঙ্গে মিশে যাবে সাহসের বিজলি। আর কোন রক্তমাংসের শরীরে সে শিখা আর কোনদিন ঝলকিত হবে কী?

অনেকক্ষণ প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে পাহাড়ের গোড়ার ঝোরাতে নেমে এল। পাথরের পাহাড় অন্ধকারের আবরণে রুস্তম আলীল নাক মুখ চেপে ধরেছে। নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে বুকটা কামারের হাঁপরের মত ফুলে উঠছে। এখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে বড় বড় ফোঁটায়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এল প্রবল বাতাস। মড় মড় শব্দে গাছের ডালপালা ভাঙছে। বজ্রেরা চিৎকারে ফেটে পড়ছে। এক ডাক শত ডাক হয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিজলির ঝিলিকে চোখ মেলে দেখল বাঁয়ে পাহাড়, সামনে পিছনে পাহাড়, কোনদিকে যাবে সে? ঝোরার পথটা তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাচ্ছে কি না জানে না। শোঁ শোঁ বেগে তুফান ছুটছে। মাথার লম্বা চুল উড়ে যাচ্ছে। রুস্তম আলীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আওয়াজ—

—'রুস্তম হুঁশিয়ার, আল্লাহও তোর লগে দুশমনি করতে আরম্ভ করেছে। তুই কিন্তু ঘাবড়াসনে।'

নিজের স্বরের দৃঢ়তায় চমকে ওঠে। কথাগুলো রূপ ধরে ফসফরাসের মত জ্বলতে থাকে। কানে রিন রিন করে বাজতে থাকে। মরণের পথে যাচ্ছে, তবু কি ব্যঞ্জনাময় তার গলার আওয়াজ। মনের ভেতরে একটা চোরা কুঠরীর তালা খুলে গেছে। আততায়ী পাথরের চোরা আঘাত অগ্রাহ্য করে রুস্তম আলী চলছে। অভিসম্পাত দিচ্ছে পাহাড়কে।

'যেখানে যেখানে আমার রক্ত পড়েছে, সেখানে সেখানে মানুষ এসে তোকে আঘাত করবে। আঘাতে আঘাতে তোকে ন্যাংটো করে ছাড়বে। মাগী।'

আহত জন্তুর মত জঙ্গল ভেঙে চলছে।

বেশ কিছুদূর গিয়ে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। বিজলি চমকালে দেখে সামনে পাহাড়। যাওয়ার পথ নেই। নিঃসাড় শরীর রুস্তম আলীর। মাথাটা পাহাড়ের ঢালুতে, পা দুটো ঝোরার ভেতর। নড়চড় করবার শক্তি নেই। মনের ভেতর কালো কালো চিন্তা এসে ছায়া ফেলছে। মনে মনে বলল—

—'রুস্তম আলী এখন আর সাহসের ঘোড়ায় চেপে উধাও হবার পথ নেই। এখানেই তোর ইচ্ছের ইতি। বহুকাল আগেই ইচ্ছের স্রোত রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। সেবার কানাইলালের বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে যখন উরুতে বর্শা বিঁধেছিল, তখনই তোর মরা উচিত ছিল। কিন্তু তুই জীবনকে অসীম সাহসে এত দূর টেনে এনেছিস। তোর সাহস তোকে মরণের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শালার পাহাড় এবার তোকে গ্রেফতার করেছে।

চুপ করে ভাবতে লাগল। এমনিভাবে যদি পড়ে থাকে তা হলে সাপে এসে কেটে যেতে পারে, বাঘে এসে আক্রমণ করতে পারে, মাথার উপর আকাশ থেকে একটা বজ্র ঝরে পড়তে পারে। ঠিকেদারের লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।

হায়রে রুস্তম আলী, এমনি বেঘোরে জানটা দেওয়ার জন্য তোর জন্ম! পশুর বিবরে প্রবেশ করার জন্যই তোর এত সাহস, এত বীরত্ব, এত সাধ্যিসাধনা। কঠিন পাথরের বুকে কফোঁটা পানি ঝরে পড়ল। বুকটা যেন তার তিন-চার টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। নিজেকে প্রশ্ন করল, আমি কি এমনি করে পড়ে থাকব? দুর্বল শরীরের রোমে ছড়িয়ে পড়ল তার প্রতিক্রিয়া। তরল তপ্ত কতকগুলো বুদবুদ জাগল। নিশ্বাসে নিঃসারিত হল 'না না।' বুকের ভেতরে কে যেন লাল চোখ মেলে হুকুম দিল এই জেগে ওঠ। অস্থিমজ্জা শিহরিত হয়ে উঠল। অন্তর পুরুষটির অমোঘ আহ্বান শিরায় শিরায় রণিত হতে থাকল। এ মহাবাক্যে শরীরের মাংসে মাংসে বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হল। উঠে দাঁড়াল রুস্তম আলী। বিজলির আলোতে দেখল একটি লতা। নেমে এসেছে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে। লতাটি ধরে ধরে খাড়া পাহাড়ের উপরে উঠার চেষ্টা করল। ধীরে খুব ধীরে লতার উপর শীর্ণ শরীরের ভার রেখে উপরের দিকে উঠছে। দুঃসাহসিক ডাকাতি অনেক করেছে, কিন্তু এমন ঝুঁকি কোনদিন গ্রহণ করেনি। অন্তর

পুরুষও এমন চরম আদেশ কোনদিন দেয়নি। হঠাৎ লতাখানি ছিঁড়ে গেল। আর সে গড়িয়ে গড়িয়ে ঝোরায় এসে পড়ল। পাথরে আঘাত লেগে মাথাটা ফেটে গেছে। মগজ বুঝি খুলির ভেতর নড়ছে। পাঁজরে ম্যাক করে শব্দ হল। একখানা হাড্ডি ভেঙে গেছে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে রুস্তম আলী। পাহাড়ি ওরলা পিঁপড়েরা তার শরীরে ভোজ শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু সংজ্ঞা হারায়নি। মনে মনে অতীতকে স্মরণ করছে। অতীতের ভাণ্ড থেকে অনুপ্রেরণা আর সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করছে। এ আততায়ী পাহাড়ের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী থেকে তাকে বের হতেই হবে। গৌরবময়ী স্বেচ্ছাচারী অতীত তার চোখের সামনে উজ্জ্বল মিনারের মত ভেসে উঠছে। সে মিনারের প্রতিটি ইট তার সাহস আর বীর্য দিয়েই গাঁথা।

খোনকারদের পনের বছরের লিকলিকে ছেলেটা মামিকে দুহাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। সে কতদিন আগের কথা। এখন মনে হচ্ছে গতকাল সকালবেলা যেন সেসব ঘটেছে। জোয়ান মামি ডাক দেয়নি, চিৎকার করেনি, ভাগনেকে ওলানের সঙ্গে চেপে ধরেছিল। বুড়ো মামা মসজিদের ইমামতি সেরে এসে দেখেছিল। তারপর থেকে কি না করেছে? চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, বদমায়েসি সব-সব করেছে রুস্তম আলী। চৌদ্দ পুরুষের নাম মুছে দিয়ে আপন বীরত্বে নিজের নামকে সমস্ত জেলার লোকের কাছে ত্রাস সঞ্চারী করে পরিচিত করেছে। নিরীহ ভেড়া চরিত্রের খোনকার বংশের রুস্তম আলী ইচ্ছের জ্বলন্ত আগুনে সেদ্ধ, দৃঢ় ধাতুতে গড়া এক বীরচরিত্রের মানুষ। তাকে কি না ফাঁকি দেয় সঙ্গীরা, তাকে কি না বেঁধে রাখে পাহাড়। হাসি পায় রুস্তম আলীর। হা হা হা হাসি পায়।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল। আরেকখানি লতা ধরে কোনরকমে বুকে হেঁটে হেঁটে উপরের দিকে উঠতে থাকে। নিজেকে আহত বন্য জন্তুর সঙ্গে তুলনা করল মনে মনে। অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের চুড়োর উপর উঠে এল। বিষ্টি ধরে গেছে, ঝড় শান্ত, বনভূমি নিস্তব্ধ। নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই কেবল বেজে যাচ্ছে। চুড়োর ওপাশের ঢালু বেয়ে কিছুদূর গিয়ে ঝর ঝর আওয়াজ শুনল। রুস্তম আলীর মনে হল তাকে ডাকছে। সরীসৃপের মত সেদিকে গেল। অনেক সময় ব্যয়ীত হল। দেখে এক জায়গায় পাহাড়ি ছড়ির জল ফুলে উঠে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ছে। হঠাৎ সে অনুভব করল, তার শরীরেও এমনি করে প্রবাহিত হচ্ছে অবরুদ্ধ ইচ্ছের ধারা। বেবাক ইচ্ছেকে জাগিয়ে তুলে সে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বেঁচে থাকতে চায়। পাহাড়ের কাছে সে নতি স্বীকার করবে না। তার মনে হল, তার হাত নেই, পা নেই, সে যেন সর্বশরীরে ইচ্ছের আগুনসম্পন্ন এক অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ। এ দুর্গম পাহাড় আর অরণ্যের বাপের সাধ্য নেই তাকে আটকে রাখে। শরীরের রক্তমাংস কিছু নয়। দাস সর্বশক্তিমান ইচ্ছের ক্রীতদাস। সে রক্তমাংস অস্থিমজ্জা সমেত এ শরীরকে টেনে নিয়ে যাবেই যাবে

পাহাড়ের ওপারে। ঝড়ের মুখে কুটো যেমন, ইচ্ছের সংহত বেগ তাকে বুকে ছ্যাঁছরিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে চলল। বুকের ভেতর থেকে ধ্বনিত হল রুস্তম আলী তুই গন্তব্য অভিমুখে যাচ্ছিস। হাতের ওপর ভর রেখে কচ্ছপের মত করে সে পাহাড়ের গোড়ায় এল। এতে তার একটুও শক্তি খরচ হয়নি। কোন অলৌকিক শক্তি যা তার ভেতর লুকিয়ে আছে অথচ চেনে না তাই যেন কাজ করে গেছে। পাহাড়ের গোড়ায় খরখরে বালু। রুস্তম আলী অনুভবে বুঝতে পারল কোন ছড়ির পাড়ে এসেছে।

বনের ভেতরে বাঙ দিল বন মোরগ। বাঙ তো নয়। পাখির কণ্ঠস্বর কেমন মুণ্ডু কাটা তলোয়ার হয়ে রাতের লোমশ শরীরে আঘাত হানে। মোরগের রক্ত ছলকানো আহ্বানের সঙ্গে তার রক্তিম হৃদয়ের মিল আছে। উভয়েই দুঃসাহসী। পূর্বদিকে চেয়ে দেখে আকাশে শুকতারা ফুটছে। মনখানা খুশির ঝর্না হয়ে গেল। দৃষ্টি রাখল পূর্বদিকে বিছিয়ে। একটু পরেই রাঙা শাল গায়ে এলেন সূর্য। আভায় আভাময় হয়ে উঠল পূর্বদিক। কুয়াশার আবরণের ফাঁকে ফাঁকে আবছা কালো কালো বিন্দুর মত দেখা গেল বিলাইছড়ির বাজারের দেকানপাট— তার গন্তব্য। মুমূর্ষু রুস্তম আলীর ওষ্ঠাধরে বিকিরিত হল ভোরের মত সরল প্রসন্ন একটুখানি সুন্দর হাসি।

পদাঘাতের পটভূমি

মেহেদি ঝোপে ঢাকা পথটা বেয়ে ঘরে ফিরছিল ছপুরা। মনটাতে আজ তার খুশির অন্ত নেই। পা দুটো চলছে— চলছে দ্রুত ঘরের টানে।

সৈয়দ বাড়ির আবু সালেকের মাকে, 'আল্লা ধনে পুতে বরকত দেউক'। আবু সালেকের মা মানুষটির দয়ার শরীর। খোনকারদের কাজ শেষ করে সৈয়দ বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে হেঁটে আসছিল ছপুরা। দেখেই পান চিবুতে চিবুতে ডাক দিলেন। ছপুরার ঘরে অনেক কাজ। কাজ থাক, তবু আবু সালেকের মার ডাক সে কি হেলাফেলা করা যায়! ছপুরা একটু আনমনা হয়েছিল। নাকের পাথর বসানো নাক চাবিটা নাড়িয়ে, দু নাকের দু ছেঁদায় রসুনের কোয়ার মত সিকনি ঝরিয়ে ডাক দিলেন।

'অ ছপুরা, অ ছপুরা হুন, পল্টনের ঘোড়ার মতন সিনা ফুলাই কডে যরগই, আয় পান খা।'

আবু সালেকের মা শুধু পান খাওয়াননি। কবে একখানা কাঁথা সেলাই করিয়েছিলেন, তার বাবদে পাকা একসের বিন্নী চাল আঁচলে বেঁধে দিলেন। বাড়িতে অমৃতসাগর কলার কাঁদি পেকেছে। তার থেকে দুটো পাকা কলা ছপুরার হাতে দিলেন। এতেও শেষ নয়। একখানা ছোট আধ পুরোনো লুঙ্গি ছপুরার সামনে মেলে ধরে বললেন

'তোর মইত্যারে পিঁদতে কইস। ল্যাঙটা ঘুরি বেড়ায়।'

ছপুরার এত সৌভাগ্য! চোখ ঠেলে পানি আসছিল। 'আবু সালেকের মার ওপর আল্লাহর রহমত অউক।'

আল্লাহর রহমত কী জিনিস তা দেখার কপাল নিয়ে জন্মায়নি ছপুরা। তবু আবু সালেকের মার মত কেউ ডেকে যখন বলেন

"অ ছপুরা, একখিলি পান খা।' কলাটা মুলাটা যখন হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলেন, 'অ ছপুরা এই সব তোরে দিলাম।' সেটাকেই ভাবে আল্লাহর রহমত। আজ সৈয়দ বাড়ির আবু সালেকের মার হাত দিয়ে আল্লাহ ছপুরার কাছে রহমত পাঠিয়েছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে ছপুরা মেহেদি ঝোপে ঢাকা পথটুকু শেষ করে ফেলল। তির তির বয়ে যাওয়া চিকন খালটির বালুচরের খুন চিকমিক করে জ্বলছে। এক ঝাঁক বালিহাঁস মাথার উপর দিয়ে যেদিকে নীল বনরেখা ঝাপসা

ঝাপসা দেখা যায়— দুদিকে যার প্রসারণ— একদিকে আরাকান অপরদিকে চট্টগ্রাম সেদিকে এক ঝাঁক তীরের মত ছুটে গেল। বালিহাঁসের তীর তীব্রগতি ছপুরার মনের ভেতর একটা আনচান করা ভাবনা টেনে আনল। খালে না নেমে ছপুরা বালুচরে দাঁড়িয়ে থাকে। বৈকালিক সূর্যের কবরী খসা তরল সোনা সাদা বালুচরে, খালের তির তিরানো জলে, গাছপালার শীর্ষে শীর্ষে ঝরে পড়ছে। পৌষ মাস, বিকেলবেলা পৃথিবীতে কেমন এক ধরনের মন্থর কোমলতা। বিলের ধান পেকেছে। আগ রাঙানো আমন ধানের ছড়া আপনার ভরে আপনি মাটির দিকে নুয়ে পড়েছে। দুজন জোয়ান মানুষ ক্ষিপ্র হাতে কাস্তে চালাচ্ছে। তাতে করে শব্দ হচ্ছে ঘসস্ ঘসস্। তৃণের অন্তিম ফরিয়াদ কাতর মিনতি যেন।

চরাচরের বুক ভেদ করে কোত্থেকে একটা করুণ কান্না যেন রূপ ধরে জেগে উঠছে। কাস্তে চালানো দুজনের একজনের মাথার লম্বা তেল মাখানো চুল কপালের দিকে এলিয়ে পড়েছে।

খালপাড় বেয়ে দক্ষিণ দিক থেকে কল কল করতে করতে একদল ধানকাটা মজুর আসছে। ওই যে দেখা যায় বনরেখা, যেখানে মাথা তুলেছে নীল নীল পাহাড়... তার পাশে সাগর। সে সাগরের পাশে বাঁশখালী থানাতেই ওদের ঘর। প্রতি বছর এমনি সময়ে কাঁথার গাট্টি মাথায় ফেলে, ধানকাটার কাস্তেখানা নিয়ে কাজের জন্য এদিক আসে ঐ উড়ে যাওয়া ঝাঁকে ঝাঁকে বালিহাঁসের মত। দুমাস পরে কিছু টাকা-পয়সা হাতে বউ বেটার কাছে ফেরত যায়।

ধানকাটা মজুরদের দেখে ছপুরা মুখে লম্বা করে ঘোমটা টানল। ছোট্ট অপরিসর কাপড়খানা টানতে গিয়ে কাঁধ আর পিঠ উদোম হয়ে গেল। ধানকাটা মজুরদের মধ্যে চ্যাঙড়া গোছের একজন ছপুরার দিকে তাকিয়ে গেয়ে উঠল—

'অ কমলা তোরে
ন দেখিলে ঘুমে ন ধরে।'

দলের আধবয়েসী একজন চ্যাঙড়াটাকে কঠোরভাবে বলল— 'এই আলম্যা বিদ্যাশ বিপ্যাঁচ পথে ঘাড়ে প্যাজামি ন গরিস।'

যুবকটি গান থামিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটতে থাকে। ধানকাটা মজুরেরা খালের বাঁকা পাড় বেয়ে উত্তরদিকে যাচ্ছে। চলার তালে তালে তাদের বোচকাগুলো দুলছে— দুলছে বোচকার সঙ্গে ঝুলে থাকা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ইস্পাতের বাঁকানো চকচকে কাস্তেগুলো।

এ ধানকাটা মজুরদের সহ্য করতে পারে না ছপুরা। ওরা মৌসুমী পাখির মত ঐ বালিহাঁসের মত আসে। কাজ উদ্ধার হলে আবার চলে যায় বালিহাঁসের মত।

আবু সালেকের মার দয়া, শীতের নরম বিকেল, খালের একনিষ্ঠ ধারাস্রোত, বালিহাঁসের স্পন্দিত বেগ, ধানকাটা মজুরদের চলার ছন্দ ছপুরার মনে মিশ্র প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি করল। সবকিছু এক যোগে তাকে আহত করে

দিয়ে গেল। স্মৃতির অত্যন্ত গভীর অত্যন্ত যন্ত্রণার্ত উৎসের রুদ্ধমুখ খুলে গেছে। বেদনার শিখা কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ঊর্ধ্ব দিকে ঠেলে ঠেলে উঠছে। প্রাণপণ শক্তিতে তার গতিরোধ করতে পারে না ছপুরা।

তার মা যে বছর মারা গেছিল, তার বাপ যে বছর মারা গেছিল, যে বছর ছপুরা মাইজপাড়ার আমজাদের বাড়িতে ধান মাড়াইয়ের কাজ করতে গিয়েছিল— তখনো সে কিশোরী; বুকের শিশুস্তন আধফোটা ফুলের মত বঙ্কিম রেখায় আঁচলের তলায় উঁকি দিচ্ছে সঙ্কুচিত কৌতূহলে। ধানকাটা মজুর পেটানকে বিরাট বিরাট দুটি চন্দ্রমণি ধানের আঁটি নিয়ে আসতে দেখে গোবর লেপা উঠোনে ধান নাড়তে কেঁপে উঠেছিল ছপুরা। আবার তাকিয়েছিল কম্পিত চোখে। কেমন জানি লজ্জা করছিল। কিন্তু চোখ ফেরাতে পারেনি। বাতাস দুফাঁক করে রেলগাড়ির মত এগিয়ে আসছে জোয়ান মানুষটি। ধানের আঁটি দুটি ঝুম ঝুম আওয়াজ দিচ্ছে। ভারের তোড়ে বাউকটা বেঁকে গেছে। শ্যামলা শরীরে জাগা অসংখ্য মেঘকালো লোমের গোড়া বেয়ে দরদর বেগে নামছে ঘাম স্রোতের মত। চোখের পলকে এসে গেল উঠোনে। উঠতি বয়সের মেয়ে ছপুরা একজন জোয়ান মরদকে দেখে যে সরে দাঁড়াবে, সে খেয়ালও হয়নি। উঠোনের উপর দিকের ধানের পাড়ায় ঝুম ঝুম করে আঁটি দুটি ফেলে পেছনের দিকে তাকাতেই ছপুরাকে দেখেছিল। বেজির দাঁতের মত সাদা দুপাটি দাঁত ঝিলিক দিয়ে জেগেছিল। এক টুকরো হাসি। জবুথবু ছপুরার দ্বিধা সংকোচের খোলস ভাঙিয়ে এক অবাধ্য কামনা তার ঠোঁটেও চিকন একখানা হাসির রেখা জাগিয়ে দিয়েছিল। এত বেহায়া কেমন করে যে হতে পেরেছিল ছপুরা এখন ভাবতে পারে না।

চালকুমড়োর দুর্বল লতাটি যেমন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠে চাল ধরে অথবা বড় গাছ যেমন করে লতার ডগাকে নিজের দিকে ডেকে নিয়ে যায়, তেমনিভাবে ছপুরা আর পেটান ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সাপিনীরা সাপদের খুঁজে বেড়ায় যেমন, তেমনি আকাঙ্ক্ষা রাতের অন্ধকারে প্রতিরাত ছপুরাকে ওপাশের বেত ঝাড়ের পেছনে নিয়ে গেছে। পেটানোর চাড়াল চাড়াল মোচের তীক্ষ্ণ পুলক জাগানো খোঁচা এখনো বুঝি মুখমণ্ডলে লেগে আছে। এখনো প্রতিরাত অনুভব করে ছপুরা দুখানি সবল বলিষ্ঠ হাত সবেগে তাকে প্রশস্ত একখানা বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছে। তার স্তনযুগল পিষ্ট করেছে। দক্ষ হাতে তাকে বিব্রস্ত করছে। ওঃ কী আনন্দ! কী সুখ! কী অনুভূতি!

সে রাত এখনো আসে। সে বাসনা এখনো খালের পানির জোয়ারের মত উত্তাল হয় বুকে! সে ছপুরা এখনো একা বিছানায় ঘুমিয়ে ছটফট করে। পেটান নেই— যে প্রথমবার কুমারী জীবনের লজ্জার বাঁধন খুলে ছিল; যে বারুণী মেলা হতে জোড়ায় জোড়ায় কাচ কিনে এনে ছপুরার মুঠি চেপে পরিয়ে দিয়েছিল, বেত ঝাড়ের পেছনে ভাঙ্গা চাঁদের আবছা আলোতে বাগডাশ দেখে ভয়ে যাকে

লতার মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছিল। অমন এলানো আত্মসমর্পণকে পায়ে ঠেলে ধানকাটা মজুর, পেটান চলে গেল। কোথায়, ছপুরা জানে না? শুধু তার পেটে রেখে গেল একটা সন্তান।

তারপরে অনেক কথা, সেসব ছপুরা ভাবতে পারে না। হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসতে চায়। চারা চারা মুলোশাক নিয়ে কোচর ভরলে যেমন হয় তেমনিভাবে পেটটা তার উঠল ফুলে। আমজাদ তাড়িয়ে দিল। সকলে দূর দূর করল। একঘরে করল। কি তবু, তবু অন্ধকারের তীব্র কামনার শিশু সূর্যের আলোতে চোখ মেলল। সে হল কলঙ্কিনী— কিন্তু মা।

অদূর সুদূর অতীতের বুকের খোঁচাগুলোর রক্ত ঝরাতে ঝরাতে ছপুরা ঘরের দাওয়ায় উঠে এল। সন্ধে হয়েছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার গাছের তলা থেকে, দিগন্তের ধার থেকে আকাশের কিনারা থেকে বন্যজন্তুর মত তেড়ে আসছে। হঠাৎ নিচু বরইগাছটাতে ঘরের পোষা লাল মোরগটার বাঙ শুনে ছপুরার রাগ ফেনিয়ে ওঠে। হাতে একখানা কঞ্চি তুলে নিয়ে রাগতস্বরে হাঁক দেয়—

'মইত্যা, এই মইত্যা, হারামজাদা পোয়া খেলা আর খেলা, আজিয়া তোর খেলা বাইর গইরগম।'

বাঁশের ঝাপটা হেঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলেছে। চেরাগ বাতি জ্বালিয়ে দেখে, ছেলে মতি ঝুল ঝুলে একখানা ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে ছেঁড়া চাটাইয়ের ওপর দলামোচা হয়ে শুয়ে আছে। ছপুরার বুকখানা ধক করে ওঠে। হাত থেকে বিণ্নী চালের পুটলী, অমৃতসাগর কলা আর আধ পুরোনো লুঙ্গিখানা খসে পড়ে। কপালের কাঁথা সরিয়ে হাত দিয়ে দেখে ধান দিলে খৈ ফুটে মত জ্বর। সেখানেই বসে পড়ে ছপুরা। ছেলের জ্বরতপ্ত গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ডাক দেয়—

'মতি-মতিয়া-মতিয়র রহমান বাপধন আর, কথা ক বাপধন, কথা ক।'

মতি অস্ফুটে কঁকাতে থাকে। সে রাতে ছপুরা রান্না করল না। কিছু খেল না। ছেলের পাশেই গালে হাত দিয়ে বসে রইল। অধিক রাতে মতির জ্বর কমে এলে তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ছপুরার ঘুম ভাঙল একটু দেরিতে। মতির জ্বর ছেড়েছে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে। বাবা মিয়া ডেকে বিছানা থেকে তুলল। গতরাতে মা ছেলে দুজনের কারো খাওয়া হয়নি! মাথাটা মুছিয়ে দিল। তারপর একটা মেটে হাঁড়িতে তাড়াতাড়ি দুটো ভাত ফুটিয়ে পাতিলের ইচা শুঁটকির সঙ্গে বাটা মরিচ মিলিয়ে খোলা সালুন বানিয়ে মায়ে পোয়ে দুজনে খেল।

ছপুরা মতিকে আবু সালেকের মার দেওয়া আধপুরোনো লুঙ্গিখানা পরতে দিল। ছোট লুঙ্গিখানি পরে মতি বরইগাছ তলায় যাচ্ছে একবার, ঘরে এসে বসছে একবার। একবার লাল মোরগের সামনে দাঁড়িয়ে যেন বলছে, 'দেখ, দেখ আমি আজ লুঙ্গি পরেছি।' মোরগটা খুশি হয়ে কো কঁরকো করে একটা বাঙ দিল। জ্বরে ম্লান মুখচ্ছবিতে একটা খুশির ভাব ফুটে উঠছে মতির।

সেদিকে তাকিয়ে ছপুরার বুকখানা ভরে গেল। মনে মনে আসমানের আল্লাহ্‌কে নিবেদন করল। হেই আল্লাহ আঁর মতিরে তুই আর জ্বর পীড়া ন দিস।

মতির গালে একটু চুমু খেয়ে বলল—

'বাপ ধন বারেটারে ন যাইস। ঘরত বই থাক। জোহরের নামায পড়িবার সময় অইলে কুড়ারে (মোরগ) পাতিলখুন দুয়া চইল দিস আবার।'

ছপুরা সারা দুপুর আমেনার বাপের মেজবানের জন্য মরিচের গুঁড়ো তৈরি করতে ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছে। অন্যান্য সময় ধারে কাছে একখানা মেজবানের নাম শুনলে মনখানা খুশিতে নেচে উঠত। এ অভাবের দিনে মা বেটা গোশত ডাল আর সুরুয়া মাখা মেজবানের ভাত খেতে পারবে! পয়সা দিয়ে গোশত কিনে নিজে খাবে, ছেলেকে খাওয়াবে তেমন সঙ্গতি ছপুরার কই। দুটো গোশত ভাতের আশায় সেধে সেধে ডালের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো করে দিয়ে আসত। কলে ছাঁটা চাল থেকে তুষ কুঁড়ো আলাদা করে দিত।

আজ ছপুরার মনখানা ভাল নয়। পরশুদিন আমেনার বাপের মরার চারদিন। সে দিন সন্ধেবেলা খানা-মেজবানী। ভুর ভুর গন্ধ ছড়ানো, মশলা গোল মরিচে পাক করা গোশতের ভাতের কথা একবারও তার মনে এল না। গুঁড়ো করা মরিচের ঘ্রাণ এসে চোখ দুটোতে জ্বালা করছে। তেমনি মরিচ লাগা জ্বালার মত বুকের তলায় কলজেখানা জ্বলছে। কি জানি মতিটার যদি আবার জ্বর আসে। সাঁঝেরবেলা ঘরে এসে দেখে যা আশঙ্কা করেছিল তাই হয়েছে। জ্বরে মতির শরীর তামার মত গরম হয়ে উঠেছে। কোন সংজ্ঞা নেই। বারবার ডাকল, 'মতি-মতিয়া, মতিয়ার রহমান—বাপধন আঁর কথা ক।'

মতি কোন জবাব দিল না। জননীর আদরের ডাক অপর্যাপ্ত উপচার জ্বরাক্রান্ত সন্তানের মুখ থেকে একটা কথাও টেনে আনতে পারল না। ডুকরে কেঁদে উঠল ছপুরা। তার কান্নার রোল শুনে দুলা মিয়ার বউটা ছপুরার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করল,

'কি ছপুরা বু, কি অইয়ে দে।'

বউয়ের গলার স্বর শুনে দজ্জাল শাশুড়িটি উঠোনের কোণার লেবুগাছটির গোড়ায় এসে বলল— 'অ বউ জারগুয়া বাজানির (জারজ ধারিণী) লগে পিরিত কিয়র। আয়, উডি আয়।'

বউটি পায়ে পায়ে চলে গেল। এমন নয় যে দুলার মার কথা ছপুরা শুনেনি। অন্য সময় হলে জবাব দিতে পারত। উপোস থাকলেও পাড়াপড়শির কাছে ছ্যাকা খেয়ে তার জিভটাও কম ধারালো হয়নি। কিন্তু তার আদরের মতি সংজ্ঞাহীন। কান্না থামিয়ে মতিকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে মনের জ্বালা মিটায়।

সমস্ত আকাশ জুড়ে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে, নেমেছে কালো রাত। খড়ে ছাওয়া চালের ফুটোর ভেতর দিয়ে আঁধারের শিয়রে মিটি মিটি একটি তারার

দীপ্তি কাঁপছে। সে বুঝি ছপুরার আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এক্ষুণি বুঝি অতল আঁধারের মধ্যে ঝরে পড়ে হারিয়ে যাবে। ছপুরা জ্বরতপ্ত ছেলের গায়ে আলতোভাবে হাত বুলোতে বুলোতে ডাকল নরম সুরে অন্তরের সমস্ত স্নেহ মিলিয়ে।

'মতি মতিয়া-মতিয়ার রহমান, বাপধন আঁর কথা ক।' ধীরে ধীরে মুখ খুলল মতি, 'মা আর বাপ ন আইব?'

ছপুরা ছেলের কথার জবাব দিতে পারল না। শুধু অনেকগুলো উথালপাতাল ঢেউ জেগে বুকের ভেতর মিলিয়ে গেল। আবার জিজ্ঞেস করল মতি, 'আইচ্ছা মা, আঁর বাপজান নাই— এই কথা হাঁছা?'

অন্য সময়ে ছেলের মুখে একথা শুনলে ছপুরা কিলিয়ে হাড্ডি মাংস এক করে ফেলত। আজ? আজ কিন্তু তার চোখ ফেটে ঝরঝর করে পানি এল বেরিয়ে। কেমন করে মা হয়ে আপন পাপের কথা নিজের সন্তানের কাছে বলবে? টুপ করে এক ফোঁটা চোখের পানি মতির গালে ঝরে পড়ল। 'মা তুই কাঁদর ক্যা? তইলে মাইনসের কথা হাঁছা! আঁর কন বাপ নাই।'

'নারে পুত, মাইনসের কথাত বিশ্বাস ন গরিস। আল্লাহরে ডাক, তুই ভাল অইলে তোর বাপ আইবো।'

'হাঁছা?'

'হ হাঁছা।'

'আই খালপাড় টালপাড় খেইলতাম যদি যাই, হেই সময় বাপজান আইলে আঁরে খবর দিস। বাপজানেরে হাঁডখুন চাইরটা চকচাইক্যা মারবেল আইনতে দিয়ম। একটা কম অইলেও নিতাম নয়।'

ছপুরা জবাব দিতে পারে না। বুকের তলাটা তার টনটন করে। অন্ধকারের আড়ালে সংগঠিত গোপন পাপের কথা ছেলের কাছে বলার জন্য আছালিপিছালি করছে তার মন। কিন্তু বলতে পারে না। গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছে। কোনরকম আত্মসংবরণ করে বলল—

'পুত আল্লাহরে ডাক, আল্লায় তোরে চাইরটা মারবেল মিলাই দিব।'

'হক্কলে বাপের কাছে চায়, তুই কস আল্লাহর কাছে চাইতাম!'

'অয় পুত যারার বাপ বিদেশ থাহে তারা আল্লাহর কাছে চায়।'

'ঠিক আছে আল্লাহর কাছে চাইয়ম চাইরট্যা চকচইক্যা মারবেল।'

'আচ্ছা চাইস'।

কি করে বলবে ছপুরা আল্লাহ যে গরিবের নয়। কাজিবাড়ি, মিয়াবাড়ি, সাহাবাড়ি পেরিয়ে আল্লাহর রহমত তার দুয়ারে চারটে চকচকে মারবেল হয়ে ঝরে পড়তে পারে না। কোনদিন না।

রাতের শেষ ভাগে জ্বর একটু কমেছিল। সকালের দিকে আবার বেড়ে গেল। ছপুরা চারদিক অন্ধকার দেখতে থাকে। এ কয়দিন তার খাওয়া নেই,

দাওয়া নেই। মতি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ করতে শুরু করেছে। উপায়ান্তর না দেখে ছপুরা পাশের বাড়ির নজীর আহমদের পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। নজীর আহমদ কবিরাজ দড়িবাঁধা চশমাটা কানে ঠিকমত লাগিয়ে ছপুরার দিকে একদৃষ্টে তাকাল। তারপর শশব্যস্ত পা দুটো পেছনে সরিয়ে বলল,

'অ ছপুরা তফাতে খাড়া— তফাতে খাড়াই কি কথা ক'।

'দাদা আঁর মতিরে বাঁচাও... পোয়ার দুই দিন ধরি হুঁশ নাই।'

কবিরাজের মুখে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটে ওঠে।

'জারগুয়া (জারজ) পোয়ার বাইর বেশি। কিচ্ছু অইত নয়! এনে ভালা অই যাইব। ছপুরা আবার 'দাদা' বলে কবিরাজের পা দুটো জড়িয়ে ধরতে গেল। নজির আহমদ সশব্দে দরজার পালা দুটো বন্ধ করে দিল।

অগত্যা ফিরে এল। হাতপাগুলো টলছে তার।

হাবিব মিয়া নামায কালাম পড়ে না বলে পাড়ার লোক মিলে তাকে একঘরে করেছে। সে বলে পাড়ার লোকের সঙ্গে মেশে না। বলে ওরা মানুষ নয়— পশু। বউ ছেলে নেই, একা মানুষ। পঞ্চাশের ওপর বয়েস। বেতের ধামা বানায়, ঝুড়ি বানায়, ডুলা বানায়, বাজারে বিক্রি করে। অবসর সময়ে সারিন্দা বাজিয়ে কাটায়।

পথের পাশের ঘর। ছপুরা টলতে টলতে সে পথ দিয়ে আসছিল। হাবিব মিয়ার সারিন্দা বাজনা শুনে ছপুরা জ্বলে উঠল। যে হাবিব মিয়ার সামনে কোনদিন যায়নি, আজ হুড়মুড় করে তার ঘরে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

'তোঁয়ার তো আনন্দের সীমা নেই। আঁর মতি যে মারা যায়। আয়রে আল্লা।'

হাবিব মিয়া স্থির দৃষ্টিতে ছপুরার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অলক্ষুণ্যা কথা না কইস ছপুরা। চল চাই যাই, কী রোগ তোর পোয়ার।'

গামছাখানা গলায় জড়িয়ে ছপুরার পিছনে এসে হাজির হয়। হাবিব মিয়া মতির মাথায় হাত রাখে। মতির হুঁশ নেই। পাশে বসে সারা শরীরে হাত বুলোতে থাকে।

বহুকষ্টে এক পয়সা দু পয়সা করে সঞ্চিত দুটো টাকা ছেঁড়া কাপড়ের গিঁট থেকে বের করে একটা গেলাস হাতে নিয়ে পানি পড়ার জন্য পির শাহ মোয়াজ্জেমের দরগার উদ্দেশে ছুটল। তাকে বাইরে যেতে দেখে হাবিব মিয়া জিজ্ঞেস করল—

'কডে যরদে ছপুরা?'

'দরগার খাদেম সাহেবের কাছে পানি পড়া আর তাবিজ আইনতাম যাইরদে।'

'কি দরকার, পির বেডা কি অষুদের ভাণ্ড লই বই রইয়ে।'

ছপুরার বুকখানা আতঙ্কে চিককুত করে উঠল। হেই পির সাব বেয়াদবি মাপ কর। হাবিব মিয়ার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার মতিকে তুমি রহম কর। হাবিব মিয়াকে ডেকে আমার জন্য আতঙ্কে আরেকবার সর্বশরীর কেঁপে উঠল তার।

জোহরের নামাযের পর খাদেম সাহেব দরগাহর চাতালে সাগরেদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় নছিহত খয়রাত করছেন। অন্যদিন হলে কেটে ফেললেও দরগার ভিটিতে উঠতে পারত না। আজ আজ কিছু গ্রাহ্যই করল না। পাগলের মত চাতালের দিকে ছুটে এল। একজন শিষ্য বলল—

'এই আউরত...নাপাক—যা ঐ জাগাত খাড়া, কদম ন বাড়াইস।' খাদেম সাহেবসহ অন্যান্য শিষ্যরা ছপুরার দিকে তাকাল। ছপুরা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল—

'বাজান তোঁয়ারা মা-বাপ, আঁর পোয়ার বেতাপ জ্বর। খাদেম ছাবর কাছত্থুন পানি পড়া আর তাবিজ লই দ্যাও।'

হাতের গেলাস আর দুটি টাকা বাঁধা পুঁটলিটা এগিয়ে দেয়। পয়সা দেখে দরগার খাদেমের শিষ্যের চোখে ধূর্ত রেখা জাগে।

পির সাহেব একটা আঙুল ডুবিয়ে পানিতে সুরা পড়ে সাতটা ফুঁক দিলেন। আচকানের জেব থেকে একটা তাবিজ বের করে দিলেন শিষ্যটির হাতে।

শিষ্যটি বলল, 'এই বেটি হুন, এই পানি খাবাবি আর শরিলত মালিশ গরি দিবি। আর পাক ছাপ হালতে তাবিজ গলাত বাঁধি দিবি। আর হুন, বাবাজানের নামে কন মহব্বতের চিজ মানত গরিবি। বুঝিলি, তোর পোয়া আপছে ভালা অই যাইব।'

ছপুরা উন্মাদিনীর মত বলল, 'বাপজান, কিছু নাই আঁর এক কুড়া ছাড়া। আঁর মতি ভালা অইলে কুড়ারে জবাই গরি আল্লাহর নামে দরগাত সিন্নি দিয়ম।'

মতির জ্বর দিন দিন বাড়ছে। খাদেম সাহেবের তাবিজ আর পানি পড়াতে কিছুই হল না। প্রলাপ বকুনি এখন অনেক বেড়েছে। চোখের মণি দুটো পচা ডিমের মত ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। দুহাতে চাটাই পাটি আঁচড়াতে শুরু করছে।

হাবিব মিয়া কোত্থেকে কিছু টাকা ধার করে রমণী ডাক্তারকে আনল। ডাক্তার স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষা করে প্রথম হোমিওপ্যাথি বটিকা পরে কবিরাজী পাঁচন খেতে দিল। আরো দুয়েকদিন ঘোরাঘুরি করে, যা খেতে চায় খেতে দিতে বলে চলে গেল।

প্রলাপ বকার ফাঁকে ফাঁকে মতি কয়েকবার মুরগির কলিজা খাবার আবদার ধরেছে। প্রত্যেকবারই ছপুরা ভাল হলে খাসির কলজে খাওয়াবে বলে ভরসা দিয়েছে।

হাবিব যখন দেখল মতির শেষ অবস্থা মোরগটা জবাই করে কলজেটা খাওয়াবার পরামর্শ দিল। পির ফকিরে বিশ্বাসহীন এ মানুষটির ধৃষ্টতা আর সহ্য

করতে পারল না। ঘরের বের করে দিল। হাবিব মিয়া বুঝতে পারছে ছপুরার এখন কোন কিছু বোধ নেই। তাই কিছুক্ষণ পর আবার রোগীর শয্যার কাছে এসে বসল। খেজুর গাছের রসের মত ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসছে পানি ছপুরার চোখ বেয়ে!

মতির গলায় ঘড় ঘড় শব্দ এসেছে। হাতে পায়ে খিল ধরেছে বারেবারে। মুখ দিয়ে ফেনা নির্গত হচ্ছে। ছপুরা আরশের আল্লাহর উদ্দেশে করজোড়ে অন্তিম মিনতি জননীর বুক ফাটা আকুতি নিবেদন করছে।

'এ্যাই আল্লাহ, তিন ভুবনের মালিক আল্লাহ, মুখ তুলি চা। পির বাবা রহম গর। তোর দরগাত আঁর লাল কুড়া জবাই গরি সিন্নি দিয়ম।'

নিকষ কালো রাত আদিম ভয়াবহতা নিয়ে নেমে এসেছে পৃথিবীতে। সমস্ত হিংস্রতা নিয়ে কৃষ্ণপক্ষের পৌষের শীত জর্জর রাতের ছবি প্রকটিত হয়েছে। আকাশে একটিও তারা নেই। রাতের নদী পলকে পলকে গড়িয়ে যাচ্ছে। শনে ছাওয়া ছোট্ট ঘরের ভেতরে যমে মানুষে চলছে টানাটানি। অত বড়, অত ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার শক্তিও বা ছোট্ট মতির কতখানি। সারা শরীর শীতল হয়ে আসছে। ঘরের ভেতরের কেরোসিনের চেরাগ বাতি হিমেল হাওয়ার তোড়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। তেমনি কাঁপছে মতির জীবন শিখা— এই বুঝি নিভে গেল।

ঘরের খাঁচার ভেতর লাল মোরগটা বার কয়েক পাখা ঝটপট করে কোঁকরকোঁ করে বাঙ দিল। পুবদিকে সোনার ঈগলের মত উঁকি দিচ্ছে সূর্য। হঠাৎ মতি তার সমস্ত শক্তি জড়ো করে ছপুরাকে বলল জড়ানো স্বরে—

'মা তুই আঁরে কুড়ার কইলজা ন খাবালি।' তারপর কয়েকবার পা দুটো নাড়া দিয়ে মতি চুপ করে গেল। ছপুরা কই মাছের কাটা মাথার মত মতির বিছানায় লুটিয়ে পড়ে মাথা কুটতে থাকল।

হাবিব ফকিরের চেষ্টায় মতির গোর দেওয়া হল। ওরা ছপুরার সমস্ত স্নেহ, সমস্ত আশা, সমস্ত ভালবাসা সাদা কাপড়ে মুড়ে কঠিন মাটির তলায় চাপা দিল।

দিন দিনের মত কেটে যায়। দুদিন ধরে ছপুরা একটু পানিও দেয়নি মুখে। এক রকম হতচেতন অবস্থাতেই কেটে গেছে দুদিন। তৃতীয় দিন পুতরে বলে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠল।

পৌষ মাসের একুশ তারিখে বাবা পির শাহ মোয়াজ্জেম সাহেবের ওরস। এ সময়ে জান্নাতবাসী পিরের উদ্দেশ্যে ছওয়াব বকশিষ করার জন্য চারদিক থেকে পিঁপড়ের মত দল বেঁধে আসে শিষ্যের দল। নামায কালাম পাঠ করা হয়, দোয়া দরুদ অঝোরে ঝরে জনতার কণ্ঠ চিরে। গরু জবাই করা হয়, খাসি জবাই করা হয়, খানা-মেজবানী হয়। এ পবিত্র সময়ে মেয়ে মানুষের কান্নার মত বিশ্রী শব্দ শুনতে পেয়ে স্বর্গত পিরের শিষ্যের দল এল তেড়ে। ছপুরা

ভাষাহীন দুটো চোখ মেলে এ হামলাবাজ লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল! তার বুকের কান্না বুকের মধ্যে জমে জমে কঠিন হতে থাকল।

সন্ধ্যাবেলা গরু খাসি জবাই হয়েছে বিস্তর। বড় বড় ডেকচিতে চড়ানো হয়েছে রান্না। বহু লোক খাটছে। হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকির অন্ত নেই। গুন গুন কোরআন পাঠের মধুর আওয়াজ ভেসে আসছে। সাত গেরামের মানুষ ভেঙে পড়েছে।

ছপুরার মানত করা লাল মোরগটা হঠাৎ কোত্থেকে এসে পির সাহেবের ফাতেহার জন্য স্তূপীকৃত ভাতের ধামায় ঠোকর দিয়ে কোঁ কোঁরকোঁ করে বাগ দিল।

পির সাহেবের একজন ভক্তশিষ্য মোরগটির এ বেয়াদবি সহ্য করতে না পেরে একখানা ইট ছুঁড়ে মারল লক্ষ্য করে! ইটখানা সোজাসুজি মোরগের গায়ে এসে লাগল। মোরগটা কেঁক করে একটা আর্তনাদ করল। আর দুজন উৎসাহী ভক্ত জখমি মোরগটাকেও পিরের ফাতেহার কাজে লাগাবার জন্য অনেক দূর পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে গেল। ভীত সন্ত্রস্ত আহত মোরগটা কঁকঁ কঁকঁ শব্দ করে উঠোনে ছপুরার সামনে এসে ঘুরে পড়ে গেল। দুয়েকবার পা দুটো টানা দিয়ে মরে গেল। চিত্রবিচিত্র পাখাগুলো চক চক করছে। শালুর মত লাল আলের জটা জ্বল জ্বল করছে।

কে একজন বলল, 'বাবার দরগাহর— এক শিষ্য মোরগটাকে ইট ছুঁড়ে মেরেছে।'

দরগার নামে ছপুরা আগুনের মত জ্বলে ওঠল। মরা মোরগটাকে দুহাতে নিয়ে উন্মাদিনীর মত উঠে এল ভিটিতে। হাজার হাজার মানুষ গম গম করছে। কেউ কিছু বলার আগে মরা মোরগটাকে নিয়ে লাল শালুতে ঢাকা মাজারের ভেতর উঠে এল। চারদিকে আগর বাতি জ্বলছে। ভক্তের দল দোয়া দরুদ পড়ছে। কেউ টেরও পেল না। ছপুরা দুহাতে মরা মোরগটা তুলে মাজারে আঘাত করে বলল

'অ পির তুই আইজো বাঁচি আছস। তোর খাদেমে আঁর দুই টেঁয়া নিল, তুই আঁর পুতরে নিলি, এখন কুড়ার গোস্ত খা, খা পির মরা কুড়ার গোস্ত খা!'

বলে কবরের উপর সমস্ত শক্তি জড়ো করে লাথি মারতে থাকে। যে পর্যন্ত না সে জ্ঞান হারাল পায়ের মুড়ি দিয়ে লাথি মেরে সমস্ত শোক ঝেড়ে ফেলার দুর্বিনীত চেষ্টায় পাগল হয়ে গেল বুঝি!

আস্বাদ

বাথরুমের পারদহীন আয়নার গর্ভে আবছা ছবিটা ভাসলো। নিজের শ্রীহীন চেহারার মুখোমুখি এমন ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়ায়নি আলম অনেকদিন। গালজোড়া দুমড়ানো এককালের কচি পাতার মত শ্যামল শিখাময় গণ্ডদেশে এখন তাকানো যায় না। ঘেন্না হয়, কান্না আসে। একি চেহারা হয়েছে আলমের। ট্যান করা মরা গরুর খালের মত আদল তার মুখমণ্ডলের। এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে মানচিত্রের বাঁকা বাঁকা দাগের মত অনেকগুলো রেখা। থুতনির নিচে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের কোমল স্নিগ্ধ অংশটুকু শুকিয়ে গেছে। কোটরের অনেক ভেতরে পচা ডিমের কুসুমের মত হলদে হলদে দেখা যাচ্ছে যে দুটো; আলমের চোখ।

দরজায় ঘা পড়ল। একটা কাশ ছাড়ল। ফ্যাশফ্যাশে আওয়াজ। বাথরুমের ওপাশে চন চন করে কণ্ঠস্বর। ছোট ভায়ের বউ। বেজার হলে হাতের চুড়ি বাজিয়ে, কানের ইয়ারিং দুলিয়ে চনচন চনচন আওয়াজ করে। স্বামীর বড় ভাই— মুরব্বি মানুষ আলম। একটুকুও কেয়ার করে না ছোট ভায়ের বউ। ছোটখাটো পটে আঁকা ছবিটির মত মনকাড়া মেয়ে মানুষ হলে কি হবে, কথার ধারে আলমের মত ভোঁতা মানুষের শরীরেও মরিচ লাগার মত জ্বালা করে।

—'আজকাল মানুষ গোসলখানাকেও দোকান মনে করে। দুই ঘণ্টা থাকা চাই।'

কি আর করে আলম। ট্যাপটা বন্ধ করে বেরিয়ে এল। ছোট ভাই ও ঘরে মক্কেল নিয়ে বসেছে। আজ আর নাস্তা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আলমের নিজেরই দোষ। গতকাল দেরি করে ঘুমিয়েছিল। সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। ভায়ের বউ স্বামী আর ছেলেকে নাস্তা দেওয়ার সময় হাজির থাকতে হয়। নইলে, কপালে নাস্তা জোটে না। এভাবে আর কতদিন চলবে?

আলম মাঝে মাঝে ভাবে। ভাবনাকে সচেতনভাবে আমল দেয় না। কিন্তু ভাবনা নিজের অজান্তেই কাজ করে যায়; আর মুখে বাঁকা বাঁকা রেখা কাটে। বউটা চলে গিয়ে আলমের অসুবিধের একশেষ করেছে। এই শীতের দিন, আলমের মত জোয়ান মানুষের কেমন করে চলে? পাশের ঘর থেকে সারারাত ছোট ভাই আর ভাই বউয়ের ফিসফিস ফিসফিস আলাপ শুনে। ঘুমুতে পারে না আলম। মনটা কেমন কেমন করে। শরীরটা এলোমেলো হয়ে যায়। কাঁথা বালিশ ফেলে দিয়ে উঠে বসে। পায়চারী করে। নয়তো অতি সন্তর্পণে ছোট

ফোকরটাতে চোখ রেখে শিকারি বেড়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কি করছে দেখতে চেষ্টা করে। এমনি করে রাত কাটে আলমের।

বউটা ছেড়ে গেছে। আর আলম গোটা মেয়ে মানুষ জাতটার ওপরেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। চাকরি জুটেনি বলে কি জুটত না কোনদিন? ব্যবসাতে একবার লোকসান হয়েছে, তাই বলে লাভ কি হত না কোনদিন? জুয়া খেলাতে সমস্ত মূলধন উড়িয়ে দেওয়ার পরে বাপ দূর দূর করল, মহকুমা শহরের মানুষ বাঁকা চোখে চাইল, বন্ধুরা ঘেন্না করল। সে সময়েই আলমের বউটার দরকার ছিল সবচেয়ে বেশি। আর বউটি কিনা সে দুঃখের সময়টাতেই পালাল। সেও তার আরেক টাউট বন্ধুর সঙ্গে। আসলে মেয়ে মানুষ জাতটাই অকৃতজ্ঞ।

আজকাল আলমের অনুভূতিও ভোঁতা হয়ে এসেছে। কেবল ভোগসুখ ছাড়া অন্য কোন সূক্ষ্মতর প্রয়োজনের কথা ভাবে না। রাতের বেলাটা হাসফাঁস করেই কাটে। প্রতি রাত আড়াই বছর সে বউয়ের সঙ্গে ঘুমিয়েছে। একা একা ঘুমুবার কি যে কষ্ট! প্রতিটি অস্থিমূলে কী যে ভূমিকম্প জাগে!

প্যান্ট শার্ট পরে সে বাড়ির বার হল। উঠোনের কুলগাছ তলাতে এসে গত রাতের অর্ধেক খাওয়া সিগারেট জ্বালাল। লম্বা লম্বা টান দিতে লাগল, যেন তার কোনরকম চিন্তা-ভাবনা নেই, কোনকালে ছিলও না।

মোল্লার দোকানে এক টাকা চার আনা বাকি। জার্মান ফেরত ক্লাস ফ্রেন্ড মেহফুজকে দেখতে যাবার সময় ধারে কিনেছিল এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট, একটা ম্যাচবাক্স, দাড়ি কামানোর ব্লেড একখানা। এক সপ্তাহ অতীত হয়ে গেছে। এখনো শোধ দেওয়া হয়নি। গতকাল মোল্লা চোখ রাঙিয়েছে। আজ সকালে শোধ না দিলে মোল্লা নাকি বাড়িতে আসবে। ছোট ভায়ের বউয়ের কানে উঠলে আস্ত রাখবে না। একবারে চোখের পর্দা ছাড়া বেহায়া মেয়েমানুষ। মোল্লাটাও ছোটলোক। পয়সা পাবি তো বেশ। কেউ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। কদিন সবুর কর। চব্বিশ ঘণ্টা কেবল পয়সা। সেটেলমেন্টের অফিসারকে বলে তোর জমি রেকর্ড করে দিয়েছিল কে? সে কথা কি এখন খেয়াল আছে। শালা একেবারে ছোটলোক। আলম যে কলেজে দু বছর পর্যন্ত পড়েছে সে সমীহটুকুও করে না।

শাহবাজপুরের মোতালেব মিয়ার খোঁয়াড় বেদখলের মামলাটারও বেশ কদিন দেরি। পয়সা কটা কোত্থেকে যোগাড় করে আলম। সাক্ষীদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে দু-পাঁচ টাকা পাওয়া যেত। শাঁসালো মানুষ মোতালেব মিয়া। পাইকপাড়ার এনায়েতের মিথ্যে এজাহার লিখে যে কটা টাকা পেয়েছিল, বোতল টেনে আর বুক চাপড়ে উড়িয়ে দিয়েছে।

হঠাৎ আলমের মাথায় একটা চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেল। কুল গাছের পাশ দিয়ে হেঁটেই সে চাচাদের বাড়িতে এল। চাচাতো বোনটি কলেজে যাওয়ার জন্য

কাপড় পরছে। ব্লাউজটা সবেমাত্র পরেছে। শাড়ির আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে বুকের পাশ দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। ব্যস্তসমস্তভাবে আলম ঘরে ঢুকে চাচাতো বোনকেই বলল, হলদে চোখ দুটি ছোট করে, যেন কোন গোপন কথা।

'নুরুন্নাহার, সেই যে কাগজে একমাস ধরে অ্যাডভারটাইজ করেছে ক্রিম, যেটা মাখলে মুখে একটা দাগও থাকে না, মায়া স্টোর এনেছে। লোকে লাইন দিয়ে কিনছে। তুই কিনলে তাড়াতাড়ি কিনে নে। পরে পাবিনে। গতকাল সন্ধ্যায় এসডিও সাহেবের স্ত্রী আর শালী এসে আধা ডজন কিনে নিয়ে গেছে!

'সত্যি কথা বলছ, আলম ভাই?' মুখের ছিঁটেফোঁটা বসন্তের দাগে হাত বুলিয়ে নুরুন্নাহার এক ধরনের উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'সত্যি না হলে তোর কাছে মিথ্যে বলে আমার কি লাভ নুরু, কত কাজ আমার।'

'খাওয়া, ঘুমোনো, আড্ডা দেওয়া এই তো তোমার কাজ। আলম ভাই, তোমার পকেট থেকে টাকা দিয়ে আমাকে একটা এনে দাও না। পরে আমি তোমাকে দিয়ে দেব।'

'আমার এখন হাতে পয়সা কড়ি নেইরে নুরু। না কিনলে পরে পস্তাবি।' বেশ নিস্পৃহভাবেই বলল আলম।

'আমারও তো নেই, আলম ভাই।' নুরুন্নাহারের মুখখানা কালো হয়ে গেল।

'দেখ চাচীর কাছে দেখ।'

'আম্মা তোমাকে পয়সা দেবে না।'

'কেন?'

'আলম ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করবে না। ক'বার তুমি পয়সা নিয়ে জিনিস এনে দাওনি!'

'কখন?' অস্ফুটে উচ্চারণ করল আলম।

নুরুন্নাহারের সুডৌল স্তন দুটো আঁটো ব্লাউজের তলায় ফুলে আছে। সেদিকে দৃষ্টি পড়তে আর কথা বেরুল না আলমের মুখ দিয়ে। চোখ জোড়া আপনি আপনি থির হয়ে এল। শরীরটাতে বয়ে গেল একটা প্রবল শিরশিরানি। নুরুন্নাহার চমকে উঠে বুকের কাপড় ঠিক করে নিল।

'আলম ভাই এখন যাও।' বলল নুরুন্নাহার।

'টাকা নিয়ে কখন জিনিস এনে দেইনি বলবি তো।' আলমের কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছে। একপা দুপা করে নুরুন্নাহারের দিকে এগুতে থাকে। তার হলদে চোখে কি একটা দেখে নুরুন্নাহার ভয় পেল। চিৎকার করে উঠল।

'আলম ভাই যাও, বাইরে যাও বলছি।'

ধমক খেয়ে বাইরে এসেও আলম চাচাতো বোনটির ফুলো ফুলো বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। নুরুন্নাহার দড়াম করে কপাট জোড়া ভেজিয়ে দিল।

পথে পা বাড়িয়ে আলম মনে মনে বলল, তোর ছেনালিপনার খবরে সারাশহর ছেয়ে গেছে। একটু তাকালাম তো সোনার অঙ্গ খসে গেল। আহারে আমার সতী। ইস মাগীর শরীরখানা পাহাড়ি বেতের মত টান টান। জড়িয়ে ধরলে ফুলে ফুলে উঠবে। আলমের নাক দিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস নামে। বেল পাকলে কাকের কী?

হাঁটতে হাঁটতে কখন মোল্লার দোকানের সামনে এসে গেছে জানে না। কেঁপে গেল শরীরখানা। আলমের ভাগ্য খুব ভাল। দোকানে মোল্লা নেই। তার বদলে মৌলানা গোছের বড় ভাইটি বসে আছে। লোকটা আবার আলমকে একটু খাতির করে। 'সালামালেকুম' বলল। অল্প একটু হাসি ফুটিয়ে বলল।

'ওয়ালায়কুমুসসালাম। মৌলানা সাব খবর ভাল তো?'

'জ্বি, আপনারা বড়লোকদের দোয়ায় আল্লাহ রাখছে একরকম।' আলমকে যখন কেউ বড়লোক বলে তোষামোদ করে বেশ ভাল লাগে। গত পরশুদিন সামাদ উকিলের বৈঠকখানায় আড়াইসিধার মতিন ভূঞার একটা মামলার পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে শহরের খাঁটি টাউট শফিক খান আলমকে একেবারে আমল দিচ্ছিল না। সামাদ উকিল কালো টাইয়ের নট বাঁধতে বাঁধতে বলেছিল :

'শফিক মিয়া, এ হল তোমার আধুনিক যুগ। আধুনিক বুদ্ধি চাই। সেকেলে পরামর্শে আর মামলা জেতা যাবে না। হাজার হোক আলম কলেজে পড়া ছেলে। তোমার মত উল্টোদিক দিয়ে পেপার ধরে না।' আলমের বুকখানা গর্বে আনন্দে দশহাত ফুলে উঠেছিল।

মোল্লার ভাইটি আবার জিজ্ঞেস করল :

'মক্কা শরীফ থেকে চাচার চিঠিপত্র কিছু এসেছে?'

জবাবে আলম মাথা নাড়ল।

'ভাগ্যবান মানুষ চাচা, এই বছর হজ্জে আকবরী। এক হজে দশ হজের ছওয়াব।'

আলম তার বাপকে চেনে। ছওয়াব গুনাহর সঙ্গে কোন সংশ্রব নেই। আলমের চাইতে বড় দরের টাউট। হারামজাদা যত টাকা খরচা করবে ঘড়ি, সোনা আর কাপড়চোপড় এনে তার চাইতে ডবল লাভ করবে। মাঝখান থেকে হাজি টাইটেলটা ফাঁকা মেরে দেবে। দুনিয়ার সব মানুষই এমনি ফাঁকিবাজ। যত কিছু মহৎ, বৃহৎ শ্রেষ্ঠ আছে সব ফাঁকি দিয়ে গড়া। সকলকে ঢিট করে আলমও নিজের নামের পতাকা উড়াতে পারত। কেবল মেয়ে মানুষটাই তাকে ভেঙে চুরে দিয়ে গেল।

হেঁটে হেঁটে কোর্টের পুকুরের পাড়ে এল আলম। এখন কোনদিকে যাবে চিন্তা করছে। থানায় নতুন ওসি এসেছে। পরিচয় করা দরকার। নয়তো আগেভাগে শফিক খান পকেটে পুরে নেবে। যেকোন সরকারি অফিসারকে আলম যেভাবে দুকথায় লাভালাভ বুঝিয়ে দিতে পারে এবং ইংরেজি মেশানো

বাংলায় তোষামোদ করে অফিসারদের আস্থা অর্জন করতে পারে, অফিসারদের গর্ববোধ আপনিই বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রভুত্বের গোপন পুলক তীক্ষ্ণ যৌনচেতনার মত অনুভব করে।

এসডিও সাহেবের বেয়ারা এসে আলমকে সালাম দিল, নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল

'কি খবর সাদেক?'

'সাহেব আপনাকে স্মরণ করেছেন।' বিনয়ে বিগলিত জবাব বেয়ারার।

হা কী আনন্দ! যে সে মানুষ নাকি আলম! কে কোথায় আছ দেখে যাও। স্বয়ং এসডিও সাহেব তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। নুরুন্নাহার ছেনালটাকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে, ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে সরলা কেবিনের টেডি ছোঁড়াদের; যারা আলমের কথার কোন দাম দেয় না। দেখে যা তোরা আলমের পজিশন। আদা পচলেও ঝাঁঝ যায় নারে। পাশের দোকানে গিয়ে বলল

'দেখি বছির আলী একটা প্যাকেট বগলা দে। দামটা এসডিও সাহেবের অফিস থেকে আসার পথে নিস।'

টিউবওয়েলের পানি থেকে একটা কুলি করে নিল। বগলা সিগারেটের গন্ধ মুখে লেগে থাকে। সাহেবের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। এখনো ছেলে মানুষ। একেবারে ছেলে মানুষ। কিছু বোঝে না। আলম মিয়ারা আছে বলেই কোন রকমে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহকুমার হাকিমগিরি।

মাথা ঝুঁকিয়ে একটা সালাম করে আলম মহকুমা হাকিমের খাসকামরায় প্রবেশ করল।

আলমকে দেখেই ছোকরা এসডিওর মুখের দুশ্চিন্তার ছায়া কেটে গেল।

'এই যে আলম মিয়া'—

'এই তো স্যার আমি।' একপাটি দাঁত দেখিয়ে বিনীতভাবে হাসে আলম।

'আলম মিয়া, একজিবিশন ফিল্ডে একটা ফাংশান করলে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ স্যার ভাল হয়, খুব ভাল হয়। সংস্কৃতির উন্নতি হবে।'

'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, সংস্কৃতির উন্নতির জন্যই আগামী দশ তারিখ একটা ফাংশান করা প্রয়োজন। ডিসি আর কমিশনার সাহেবকে দাওয়াত করেছি।'

'খুব ভাল করেছেন স্যার, এ শহরে আপনার মত দরদি মানে কাইন্ডহার্টেড হাকিম আগে আর আসেইনি।'

'তা তো হল। কিন্তু শিল্পীরা নাকি আসবে না বলেছে।'

'কেন আসবে না স্যার, আসতেই হবে, খেলা পেয়েছে নাকি, যতসব ছোটলোক, মহকুমা হাকিমের হুকুম হেলাফেলা করা যায়? সে আমি দেখব। আমার ওপর সব ভার ছেড়ে দিন স্যার।'

'সব ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। দেখবেন আমার সম্মান যেন মাটি না হয়।'

'সে কি স্যার, আমরা থাকতে আপনার সম্মান মাটি! তবে খরচ পাতিটা—

'সে আমি দেখব।'

এক কাপ ফিকে চা খেয়ে নতুন মানুষ হয়ে বের হল আলম। নতুন দায়িত্ব তার বুকে সাহস এনে দিয়েছে। মনে মনে হিসেব করে। কমসে কম দুশ টাকার মত হাতিয়ে নেওয়া যাবে। আলমের মত একজন মানুষের জন্য যাকে বলে গ্র্যান্ড অপারচুনিটি। কোর্টের বারান্দায় দু দুবার আগা গোড়া পায়চারী করল। এ তার নিজের জগৎ। মামলা-মোকদ্দমা, আসামি, বাদী, ফরিয়াদি এসব মানেই তো পয়সা। ঘাঁটতে ঘাঁটতে আলমের মগজ একেবারে পেকে গেছে। আইনের ধারা তার মুখস্থ। কেন যে উকিল হল না, সেজন্য আলমের ভারি আফশোস হয়।

কোর্টের বারান্দা থেকে ঢেউ কাঁপা বুকে রাস্তায় নেমে কোনদিকে যাবে ঠিক করতে পারল না। এসডিও সাহেব তার কাঁধে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন। যেমন তেমন মানুষ নাকি আলম। আগে গেলেও এখন যেখানে সেখানে যেতে পারে নাকি! আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে কষে কষে টান দিয়ে ধোঁয়া গিলতে লাগল। ভাবভঙ্গিতে এমন একটা অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল, পৃথিবীকে যেন সে থোড়াই কেয়ার করে। দুজন কলেজের ছাত্র এল। একজন আলমকে বলল :

'আলম ভাই, আগামী পনের তারিখ আমাদের সম্মেলন, আপনাকে আমাদের হয়ে খাটতে হবে, অন্য দলে যেতে পারবেন না, আগে বলে রাখলাম।'

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই জবাব দিল আলম মিয়া।

'তোমাদের পোলাপানের দলাদলিতে আমি নেই। মাথা গরম গোঁয়ার সব।'

অন্য ছেলেটি বলল

—'মালেক চলে আয়। আলম মিয়া কোথায় পয়সার গন্ধ পেয়েছে। পয়সা ফুরোলে আপনি আসবে। আগে বললে দর বাড়বে।'

মাথা গরম চ্যাংড়াদের কথায় কান দিলে আলমের মত মানুষের কি চলে? ডানে বামে একটুও না তাকিয়ে ইনশাল্লাহ হোটেলে এসে ঢুকল। আজকে আলমের ভাগ্য ভাল। সোলতানপুরের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা হোটেলে। তিনি আলমকে খুব খাতির করেন। নিজে বকলম, দরখাস্ত ইত্যাদি আলমকে দিয়ে লিখিয়ে নেন কিনা। তিনিও এসেছেন এক মামলার ব্যাপারে। মক্কেলকে ধরে আলমকে বিরিয়ানি খাইয়ে দিলেন। আলম চেয়ারম্যান সাহেবের দরাজ দিল হওয়ার পেছনের কারণ জেনে গেল। পরের পয়সা। এসে বলে মেজবানের ভাত দিয়ে ফকির বিদায় করা। বিরিয়ানি খেতে খুব ভাল লাগল। সকাল থেকে কিছু খায়নি। ঠেসে ঠেসে খেয়ে সাড়ে তিন টাকা বিল তুলে দিল।

ইনশাআল্লাহ, হোটেল থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে ভাবতে লাগল। দিনের চারভাগের তিন ভাগ বাকি। পেটটা খুব ভারি হয়েছে কিনা, দূরেটুরে কোথাও

যেতে পারবে না। করার মত কিছু হাতের কাছে না পেয়ে স্কুলগামী মেয়েদের বুক আর পাছা দেখতে লাগল।

তারপরে গিয়ে রফিক ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে বসল। নতুন ডিসপেনসারি, শ্বশুরের পয়সায় করা, ডাক্তারও নতুন। পাস করে সবেমাত্র মেডিকেল কলেজ থেকে বেরিয়েছে। এ শহরে পসার জমাতে হলে আলমের মত মানুষকে তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। সেজন্য ডাক্তার আলমকে একটু খাতির করল।

'আসুন আলম সাহেব, বসুন।'

আলম এসে বসল। ডাক্তার একটা সিগারেট দিল। দামি সিগারেট। আরাম করে টান দিয়ে গলাখাকারি দিয়ে কথা শুরু করল আলম।

'আচ্ছা ডাক্তার সাহেব, কোন দেশে নাকি মানুষকে সারাজীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য গবেষণা চলেছে, কোন্ দেশে?

'হ্যাঁ, সোভিয়েত রাশিয়াতে তেমন গবেষণা হচ্ছে বলে শুনেছি।' জবাব দিল ডাক্তার অন্যমনস্কভাবে। রাস্তার দিকে চোখ ডাক্তারের। রোগী হওয়ার মত কোন মানুষ চোখে পড়ে কিনা দেখছে।

বেশ বীরের মত মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গিতে আলম বলল :

'এ হতভাগা দেশে কিছুই হয় না। রাজনীতিই হয় না আর কি হবে?

'কেন রাজনীতি হবে না?'

আলম চেয়ে দেখে কাদির মিয়া ডিসপেনসারিতে ঢুকছে। পরনে ডেক্রোন, টেট্রোন জাতীয় পোশাক। ঝানু রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতিই পেশা। বছরে দু-দুবার করে দল বদলায়। একটু সংযত হল আলম। কাদির ভয়ানক মানুষ, রাগলে উঁচু নিচু জ্ঞান থাকে না। একটু তোষামোদ করা প্রয়োজন।

'অ কাদির ভাই নাকি। আস, আস, বস। বলি কি আর সাধে, তোমার মত দশজন আদর্শবাদী কর্মী থাকলেও রাজনীতিতে সততা বলে একটা জিনিস থাকত। অনেক অনেকদিন ধরে তো রাজনীতি করছ বলতে গেলে, ও একরকম নেশা হয়েছে। তোমার নিজের মত একজনও খাঁটি মানুষ দেখেছ? তাই তো বলি, আলমের কথা টাটকা কিছু না, দু-চারদিন বাসী হলেই ঠিক ফলে যাবে।'

কাদির মিয়া মাথা নেড়ে নেড়ে বলল

'হ্যাঁ, আলম মিয়া ঠিক বলেছ, আজকাল রাজনীতিতে সততা নেই।'

ডাক্তারের দোকান থেকে এসে আলম একটা লম্বা ঘুম দিল। ঘুমের ভেতর চওড়া চওড়া অনেকগুলো স্বপ্ন দেখল।

সন্ধেবেলা আলম একটু সাজগোজ করল। পাটভাঙা জামা পরল। ছোট ভায়ের বউ কোথায় গেছে। সে সুযোগে তার ঘরে ঢুকে মুখে আধ ইঞ্চি করে স্নো পাউডার মাখল। তারপর এল সরলা কেবিনে। আড্ডা জমে উঠেছে। কাপ পিরিচের টুং টাং শব্দ হচ্ছে। রেডিও বাজছে। এমনি সন্ধ্যায় মনখানা প্রসারিত

হতে হতে আকাশ হয়ে যায়। তখন নিজেকে পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট মনে হয়। এ শহরে কত লোক এল গেল। কেবল আলম রয়ে গেল— একা। নিঃসঙ্গ কাল ভৈরবের মূর্তির মত। নিঃসঙ্গতার কথা ভাবে না বেশি।

কেবিনে ঢুকেই দেখল কোণার দিকে বসে আছে কল্যাণ সেন। কল্যাণ গান গায়। এসডিও তার কাঁধে যে মহান দায়িত্ব দিয়েছে, খবরটা প্রচার করার একটা চমৎকার সুযোগ মিলে গেল। একেবারে কল্যাণ সেনের সামনের চেয়ারটিতে এসে বসল। কর্তার ভঙ্গিতে ডাক দিল

'কল্যাণ'।

কল্যাণ সেন চোখ তুলে চাইল।

'শুন, আগামী দশ তারিখে একজিবিশন ফিল্ডে ফাংশান হবে। তোদের সকলকে থাকতে হবে। ডিসি সাহেব কমিশনার সাহেব সকলেই আসবেন। দেখিয়ে দেওয়া চাই কেরামতি। পয়সা কড়ি কত নিবি... আগেভাগে কথাবার্তা বলে ফেল। পরে মন কালো করা চলবে না। এবার আমার ওপর দায়িত্ব।'

আলমের গোপন ইচ্ছে পূর্ণ হল। কেবিনের সমস্ত লোক তার দিকে তাকাল। কল্যাণ সেনের কিন্তু কোন ভাবান্তর হল না, সে বলল—

'না, এসডিও সাহেবের ফাংশানে আমরা যাব না। গতবার আমাদের অপমান করেছে।'

'কি বললি তুই? এসডিও সাহেব অপমান করেছেন? অসম্ভব, আমি বিশ্বাস করিনে। এমন হাকিম এ শহরে আসেইনি। তবে বয়েসটা একটু কম, সেজন্য মেজাজটা চড়া। ও কিচ্ছু না। আমাদের মহকুমার হাকিম তো। আমরা সেগুলো ক্ষমা করে না দিলে কে ক্ষমা করবে? খবরদার কল্যাণ, মুখেও আনিসনে এসডিও সাহেব তোদের অপমান করেছেন। আসল কথা বলি, গতবার কতিপয় চাষার হাতে ফাংশানের ভার দিল। তারা কালচারের কি বোঝে। সেজন্য ঠিকমত ইজ্জতটা পাসনি। এবার আমার ওপর ভার— জানিস তো আমি মানুষটি কেমন?'

'তা হোক আলম সাহেব, আমরা পারব না, ঐদিন নেত্রকোণাতে আমাদের বায়না আছে।'

'তোমাদের থাকতে হবে।'

'না থাকলে মারবেন নাকি?'

'মারার বেশি করব।'

'কী করবেন?'

'পুলিশ দিয়ে বেঁধে নেওয়াব।'

'ইস ঘরের কোণার বাঁদীর খসম, পুলিশ দিয়ে বেঁদে নেব।' কল্যাণ মুখ ভ্যাংচাল।

হঠাৎ আলম কল্যাণ সেনের শার্টের কলারে হাত দিয়ে ফেলল, দুটো ঝাঁকানি দিয়ে বলল

'মুখ সামলে কথা বলিস কল্যাণ।'

কল্যাণের রোখ চেপেছে, মাথায় রক্ত চড়েছে। ধাবড়া হাত দিয়ে আলমকে কিল আর ঘুষি দিতে থাকে। হাতের সুখ মিটিয়ে মেরে কল্যাণ সেন চলে গেল। এতক্ষণ যারা ঝগড়া দেখছিল এবার হাতে তালি দিয়ে উঠল।

আলম নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল। পৃথিবীটা দুলছে, কোথায় বুঝি একটা ভূমিকম্প হয়ে গেছে। পরাজিত রাজার মত সন্ধের অন্ধকারে আলম পালিয়ে গেল। সমস্ত শহর যেন তার পিছে পিছে পাগল হয়ে আসছে। তাকে ব্যঙ্গ করছে।

অনেক রাত পর্যন্ত মডেল স্কুলের মাঠে একাকী বসে রইল আলম। তার বাঁচার মত আর কিছু নেই। আসলে তো সে 'অনেক কাল আগেই মারা গেছে। ক্ষণভঙ্গুর একটা কাঠামোর ওপর দম দেওয়া পুতুলের মত এতকাল চলাফেরা করছিল। এক চড়ে কল্যাণ সে কাঠামো চুরমার করে দিল। তার বেঁচে থাকার মত কোন বন্ধন নেই। স্নেহ, প্রেম, মায়া, মমতা কোন কিছুর বন্ধন নেই। সুতরাং সে আত্মহত্যা করবে। আত্মহত্যার কথাটা মনে আসা মাত্রই তার মন হু হু করে উঠল।

মাইজপাড়ার মাঝ দিয়ে যে গলিটা গেছে, সে গলিটা বেয়ে আলম রেল লাইন অভিমুখে এগুতে থাকে। আকাশে গোল হয়ে চাঁদ ওঠেছে। আলো লুটিয়ে পড়েছে। মন্দিরের সামনের দিঘিটার কালো জলে আলো লেগে চিলিক মিলিক জ্বলছে। বড় বড় শাপলা ফুল ফুটেছে। ছেলেবেলায় আলম এ দিঘিতে সাঁতার কেটেছে, শাপলা তুলেছে। এ দিঘি আর কোনদিন দেখবে না, দেখবে না চাঁদের আলো, তুলবে না শাপলা। এ পথে হাঁটবে না কোনদিন। আলমের কোটরাগত চোখের গর্ত দুটো পানিতে ভরে এল। জীবনের প্রতিটি ছোটখাট ঘটনা চোখের সামনে ফুলের মত ফুটে উঠতে থাকল। কি মধুর কবিতা এ জীবন! একটু পরেই ইতি। কাল শহরের লোক আলম নামের কোন মানুষকে দেখবে না।

ঐ তো রেলের লাইন। চাঁদের আলোতে কেমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে। লোহার পাত দুটো যেন কাপালিকের মত হাসছে, তার শরীরের লাল রস পান করবে বলে। আলমের শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে আর অসার হয়ে আসছে সমস্ত চেতনা। হিম হিম স্পর্শ অনুভব করছে। শিতল হয়ে যাচ্ছে সারা শরীর। লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে রইল আলম। গাড়ির হুইসল বেজেছে। বুকের ভেতর শব্দ হচ্ছে। একি কিছু চিন্তা করতে পারছে না কেন? লাইন থেকে পা তুলতে পারছে না। এগিয়ে আসছে ট্রেন। দুপাশে আলো ছড়িয়ে পড়ছে। আলম হেড লাইটের দিকে চেয়ে রইল। লোহার পাত দুখানা চুম্বকের মত আকর্ষণে তার শরীর বেঁধে রাখল। সে নড়তে পারে না, পড়তে পারে না। এগিয়ে আসছে

গাড়ি। আসছে যেন তার বুকের ভেতর দিয়ে— শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ ওদিকে একটি লোক উঠে দাঁড়াল। লোকটি কী করছিল? ওয়াক থু! পায়খানা করছিল। এমন নোংরা জায়গায়ও মানুষ আত্মহত্যা করে। ছিঃ ছিঃ এক লাফে আলম রেল লাইনের বাইরে চলে এল।

গাড়িটা চলে গেল। আলমের খেয়াল হল সে বেঁচে আছে। কুৎসিত মৃত্যুকে ফাঁকি দিতে পেরেছে। এ আনন্দে পাগলের মত নাচতে লাগল। হৃৎপিণ্ডের শব্দের তলায় ট্রেনের শব্দ চাপা পড়ে গেল। জীবনের ঘন গভীর এমন স্বাদ আর কোনদিন পায়নি আলম।

প্রতিপক্ষ

জামাল সাহেবের বুকের ভেতরে জ্বলছে মরিচ লাগার মত সহ্যের অতীত জ্বালা। হৃদয়ের শূন্য গহ্বর মথিত করে ফোঁস ফোঁস দীর্ঘনিশ্বাস বেরুচ্ছে। বাইরে ডাকছে পাখি 'বউ কথা কও'। চাঁদের আলোতে ভাসছে শহর দুধের সরের মত। জানালা দিয়ে দেখেন হাল্কা তুলতুলে সাদা সাদা মেঘ ডানা মেলে উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। মিটি মিটি তারার আলো শিউরে শিউরে কাঁপছে। দক্ষিণে চরের মত জেগে উঠছে থরে থরে জলবাহী নবীন মেঘ। চন্দ্রবোড়া সাপের মত ফণা মেলে চিরকি মেরে নেচে উঠছে বিজুলির বাঁকা ছুরি। কালো স্লেটের মত প্রসারমান ঘন কাজল ছায়ার মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বাজ পড়ছে কড় কড়। চোখ ধাঁধাঁনো আলোর ঝলক লেগে তুষের আগুনের মত বুকের ধুঁইয়ে জ্বলা আগুনে তরুণ বেদনার স্ফুলিঙ্গ ফুটছে ফুলঝুরির মত। আকাশের চারকোণ ছেয়ে উঠেছে কালো মেঘ। কালো গাইয়ের ওলানের মত। একটু পরে বৃষ্টি নামল। ঝরঝরিয়ে। একটানা কান্নার মত আকাশের কালো গভীর ক্রন্দসী চোখের জল অবিরাম সুরের সিম্পনি হয়ে ঝরতে থাকল।

এমন বৃষ্টি হঠাৎ বৃষ্টি, কোমল বৃষ্টি, বুকের ভেতরটা পর্যন্ত ভিজিয়ে দেওয়া বৃষ্টিতে কি চোখে ঘুম আসে। মনের ভেতরে কে যেন কাঁদছে। পুরোনো বেদনারা স্মৃতির কাদায় কেঁচোর মত থিক থিক করছে। মনোভূমির প্রতি তন্ত্রীতে প্লাবন, মনের চাতালে বৃষ্টি ঝরছে ঝুম ঝুম। কত বৈশাখের শুষ্ক দাহন জল হয়ে গলছে।

আধ পড়া ইংরেজি উপন্যাসখানা খুলে বসলেন জামাল সাহেব। বাইরে বৃষ্টির বাজনা ঝুমঝুম। বইয়ের পাতায় চোখ রাখলেন তিনি। নায়ক নায়িকাকে নিয়ে গেছে সমুদ্র সৈকতে। অনন্ত নীল নোনা পানি। ঢেউয়ের মাথায় সাদা সাদা ফুলের স্তবের মত ভাসমান ফেনা। লাল রক্তপিণ্ডের মত সূর্যটি সমুদ্রে ডুবছে। আকাশের সিঁদুর লেপা ললাটের শিয়রে একটি তারা ফুলের মত ফুটি ফুটি করছে। এমনি সময় এমনি পরিবেশ। মুখের কথা ক্ষেপা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়, সমুদ্রের হু হু গর্জনের তলায় চাপা পড়ে। জেগে থাকে শুধু বুকের ক্রন্দন। রক্তের ক্রন্দনে স্পন্দিত বুকে কেবল মাদল বাজে, কেবল বাজে। নায়ক নায়িকাকে কাছে ডাকল, হাতে হাত রাখল, মুখে মুখ রাখল, শরীরে শরীর।

সামনে অথৈ নীল নোনা পানির বিস্তার। বাতাসে হু হু গর্জন। আর পড়তে পারলেন না। উঠে দাঁড়ালেন। পড়ে রইল খোলা বই। শরীরের রক্তে উজানমুখী তরঙ্গ ভাঙছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর অনেকদিন তিনি এমন অনুভব করেননি। দুঃখ পচা গ্যাস দীর্ঘশ্বাসের আকারে অনেক করেছে। টাটকা তাজা কামনা রক্তের মাতনে সাপের ছোবলের মত হিস হিস করে অনেকদিন জাগেনি।

বাতি নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকার ঘরে আগাগোড়া দুবার পায়চারি করলেন। সমস্ত শরীরটা আগুন হয়ে উঠেছে। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে নিজের মেয়ে। তার নাক ডাকার শব্দ আসছে। ডানদিকে পুরুষ চাকরদের ঘর। বাঁদিকেরটা কিচেন। কিচেনে ঘুমোয় চাকরানী সখিনা। তিন তিনজন স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই জামাল সাহেবের বাড়িতে আছেন। সখিনার ঘরের দিকে তাঁর পা দুটো ছুটে যেতে চাচ্ছে। চোখে সখিনার বেসামাল শরীরখানাই ভাসছে। কিন্তু জামাল সাহেব একজন মানী লোক। তিনি কি একজন চাকরানীর ঘরে যেতে পারেন? বাইরে বৃষ্টি ঝরছে, মেঘ ডাকছে, বাতাস ফুঁসছে। জামাল সাহেবের শরীরে রক্তের উত্তাপিত তৃষ্ণা আগুন হয়ে জাগছে। তিনি ভুলে গেলেন সখিনা চাকরানী।

দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে প্রায় আধভেজা হয়ে কিচেনের দুয়ারে এসে টোকা দিলেন। ভেতরে মেয়ে মানুষটি যেন আগে হতে তৈরি হয়েই ছিল। হুট করে দরজা খুলে দিল। চটপট বাতি জ্বালালো। জামাল সাহেব ভেতরে এসে ঢুকলেন। মুখের কাছে আঙুল নিয়ে ফিসফিসিয়ে বাতি নিভিয়ে দিতে বললেন। সখিনার চোখের কোণা ঝিকিয়ে উঠল। ঠোঁটের ডগায় হাসি খেলে গেল।

—এই রাইতের বেলায় কীয়ের লোভে আইছেন হেত জানি। বাড়িরে ডরাইয়া কি অইবো। যান বয়েন।'

আলগোছে ঘরের কপাট জোড়া বন্ধ করে দিল। লেফাফাদুরস্ত জামাল সাহেব সখিনার ভাঙা তক্তপোষের উপর উঠে বসলেন। নোংরা নোংরা তেল চিট চিটে ঝুল ঝুলে কাঁথার পচা পচা গন্ধে তাঁর গা গুলিয়ে বমি আসছিল। সখিনা আদরের স্বামীটির মত গায়ে হাত বুলিয়ে জামাল সাহেবকে শুইয়ে দিল। নির্ভাবনায় টান টান গতরখানা মেলে ধরল। বৃষ্টিতে ভেজা এঁটেল মাটির কাদার মত জামাল সাহেবের শরীরের সঙ্গে একসা হয়ে লেগে রইল। বহুদিন পর মেয়ে মানুষকে দুবাহুর মধ্যে পেয়ে জামাল সাহেব কাঙ্গালের মত ভোগ করলেন, তৃষ্ণার্তের মত পান করলেন।

বৃষ্টি থেমে গেলে তিনি সখিনার ঘর থেকে উঠে এলেন। নিজের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাতেই তার স্বর্গত স্ত্রীর অয়েলের ছবিটার দিকে চোখ গেল। বুকটা ধক করে উঠল। নালিশের ভঙ্গিতে স্ত্রীর চোখ দুটো তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, যেন জামাল সাহেবকে বলছে, তোমাকে হাতে নাতে ধরে ফেলেছি। ছি! ছি! একটা চাকরানীর সঙ্গে...। দুটো শিল্পীর আঁকা চোখ—চোখ তো নয় যেন ক্ষুব্ধ

ফরিয়াদি আত্মার থর থর কাঁপা দুটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। শানিত দৃষ্টি ছুরির মত এসে বিঁধেছে বিবেকের শরীরে। তিনি অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠলেন।

—'হায় আল্লা একি করলাম।'

বুকে জ্বলন্ত চিতা নিয়ে তিনি ঘুমোতে গেলেন। অন্ধকারের মধ্যে ডানকান হত্যার সময়ে ম্যাকবেথ কর্তৃক দৃষ্ট ঐন্দ্রজালিকে ছুরিকার মত সে দুটো জিঘাংসিত চোখই তিনি দেখলেন। ইস, মুহূর্তের ভুলে কী করে ফেললেন। লজ্জায় সমস্ত শরীরের জোড়া আলগা হয়ে আসছে। কাল ভোরে তিনি কেমন করে মুখ দেখাবেন? রাতভর অনুশোচনার ক্ষিপ্র ছুরি তাঁকে ফালি ফালি করে চিরল, খণ্ড খণ্ড করে কাটলো।

পরের দিন জামাল সাহেব ভাল করে মুখ তুলে তাকাতে পারলেন না। কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। চাকর-বাকরেরা চিরদিনের বদমেজাজি জামাল সাহেবকে হঠাৎ শান্তশিষ্ট দেখতে পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তিনি আড় চোখে চাকর-বাকর সকলের চোখ মুখ খুঁটিয়ে পরখ করে দেখলেন গত রাতের ঘটনার কোন ছায়া কারো মুখে লেগেছে কিনা। আতশ কাচের মত দৃষ্টিতে দেখে নিলেন। না কেউ টের পায়নি। রাতের অন্ধকারের যে গোপন পুলক এখনো শিরায় তানপুরার বোলের মত কাঁপছে সে খবর কেউ জানে না। অন্ধকারের যে লজ্জা মনে বোঝার মত চেপে বসেছে, সে খবর কেউ জানতে পারেনি। আশ্বস্ত হলেন।

বাজারের হিসেব দিতে এল সখিনা। একটু আগে গা ধুয়েছে। চুলে নারকোল তেল মেখেছে। কালো শরীরে কালো চুল ছাড়াছাড়াভাবে ছড়িয়ে আছে। নীল রঙের একটি শাড়িতে শরীর ঢেকেছে। তার মুখে রহস্যকুঁটিল হাসি। চোখে ওত পাতা ঝানু কুমিরের মত ঘোলাটে দৃষ্টি। ব্লাউজের ছেঁড়া অংশ দিয়ে পাতার তলায় আধপাকা পেয়ারার মত ডাঁসা মাংসল রক্তিম শিরাল স্তনের কালো বোঁটা উকি দিচ্ছে। কাপড় ঠিক করার অছিলায় সখিনা কায়দা করে জামাল সাহেবকে বুক দেখিয়ে দিল! জামাল সাহেব লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলেন।

সারা দুপুরবেলা চিন্তা করে স্থির করলেন জীবনে তিনি আর কোনদিন সখিনার ফাঁদে পা দেবেন না। সংকল্প শক্ত করার জন্য মাগরেবের নামায পড়লেন। লাইব্রেরিতে গিয়ে পবিত্র জীবনের ওপর লেখা আস্ত একখানি বই পড়ে ফেললেন। একটু রাত করেই বাড়িতে এলেন। মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোকরা চাকরটা তাঁর অপেক্ষায় ডাইনিং টেবিলের পাশে বসে চোখ জড়ানো ঘুমে ঢুলছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে তিনি বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় লম্বা হলেন। ঘুম আসছে না, শরীরটা মোচড় খেলছে! এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। মনে মনে কেঁপে উঠলেন। সর্বনাশ, সখিনা এসেছে। বাঘিনী মাংসের স্বাদ পেয়েছে।

পাশের ঘরে নিজের মেয়ে, ওপাশে চাকরবাকর। কে কখন দেখে ফেলে? জানালাগুলো লঘু হাতে বন্ধ করে আলো জ্বাললেন। তারপর দরজা খুললেন। ঘরে ঢুকল সখিনা। সে সময়ে স্ত্রীর ছবিটার দিকে তার চোখ গেল। দুটো কালো চোখের উদ্ধত শানিত চাউনি। তিনি ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলেন। সখিনা শুধোল ফিসফিসিয়ে

—'কাঁপেন ক্যান?'

'চোখ, চোখ,' ভয়ার্ত স্বর বেরিয়ে এল জামাল সাহেবের মুখ দিয়ে।

—'কই?' জানতে চাইল সখিনা।

জামাল সাহেব স্ত্রীর ছবির চোখ দুটোর দিকে তর্জনী বাড়িয়ে ধরলেন।

সখিনার ঠোঁটে বিচিত্র জটিল হাসি। কাজল মাখা ভুরু দুটো অবজ্ঞায় কুঁচকে এল। পানখাওয়া গ্যাটগ্যাটে লাল দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে। একটানে ছবিটা নামিয়ে খাটের তলায় রেখে বাতি নিভিয়ে দেয়। জামাল সাহেবের কোমরে একখানা হাত দিয়ে বলে,

—'আয়েন, হেই চৌক এহন হপ্পন দেখছে।'

জামাল সাহেবকে যেতে হয়। নিজের ধবধবে বকের পালকের মত সাদা বিছানায় শুয়ে সখিনার শরীরের সঙ্গে শরীর মিশাতে হয়। এমনি মেয়ে মানুষ সখিনা। উঠে আসতে চাইলেও দেয় না। ক্লান্তিকে কেয়ার করে না, সংশয়ের ধার ধারে না। এমনি পাথর ফাটানো তৃষ্ণা। প্রতি রাত আসে। দরজায় টোকা দিলে পুতুলের মতে দরজা খুলে দেয়। এদিকে ভয়ে পেটের ভাত হজম হয় না। ছেলে-মেয়ের বাবা সমাজে প্রতিষ্ঠাবান মানুষ। একথা একবার চাউর হয়ে গেলে তাঁর পক্ষে জীবনে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ছি! ছি! লোকে শুনলে বলবে কী? সখিনার হাত থেকে উদ্ধার হতে না পারলে তাঁর নিস্তার নেই। ভেবে ভেবে একটি চমৎকার ফন্দি বের করলেন। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে ছেলে হলে থাকে। রুক্ষ মেজাজের জন্য জামাল সাহেব বাধ্য হয়ে ছেলেকে হলে পাঠিয়েছেন। বাড়িতে থাকলে একে মারে, ওকে বকে। এটা ভাঙে সেটা নষ্ট করে। মেয়েদেরকে একদম দেখতে পারে না। স্ত্রী দুঃখ করে বলতেন

—'আমার পেটে এজিদ ধরেছি, মার সঙ্গে কী ব্যবহার করতে হয় তাও জানে না।'

সখিনাকে তাড়াবার জন্য জামাল সাহেব গরমের ছুটিতে ছেলেকে হল ছেড়ে বাড়ি এসে থাকতে আদেশ করলেন। ছেলে এলে এক মাসের জন্য তার কাঁধে বাড়িঘরের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। জিনিস-পত্তর বাঁধা ছাঁদা হচ্ছে। সখিনা আড়চোখে সবকিছু দেখছে।

তার মুখে থেকে থেকে জাগছে সূক্ষ্ম শানিত হাসি। চোখের দৃষ্টি হয়ে উঠছে কুটিল থেকে কুটিলতর। ভাবখানা এমন, এসব কি আমার অজানা? কিচেনের পাশে জামাল সাহেবকে সন্তর্পণে হেঁটে আসতে দেখে সখিনা জিজ্ঞেসই করে বসল :

—'পালাইতাছেন বুঝি।'

জামাল সাহেব কোন জবাব না দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এলেন। বাড়িঘর এবং আলমারির চাবি ছেলের হাতে তুলে দিলেন। যাবার সময় কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন

—'আলমগীর, সখিনাটি ভারি বজ্জাত, পারিস তো বিদায় করে দিয়ে আর কাউকে রাখিস।'

তিনি দেশের বাড়ি থেকে ফিরে এলেন একমাস পরে। মনে স্থির ধারণা করেছিলেন, সখিনা আর বাড়িতে নেই। আলমগীর কবে গলা ধাক্কা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বের করে দিয়েছে। ঢুকেই দেখতে পেলেন সখিনা উঠোনে চুল শুকাচ্ছে। ঝাড়া ঝাড়া কালো চুলের রাশি পিঠের ওপর ভেঙে পড়েছে। চোখ কপালে তুললেন জামাল সাহেব। মাথায় হাত দিয়ে খাটের কোণায় বসে পড়লেন। গভীর জলের আবর্তের মত সখিনার চোরা চোখের বাঁকা দৃষ্টি তিনি চিনেন। ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়ার মত পুরুষ মানুষের সমস্ত কামচেতনাকে খুঁচিয়ে তোলে সে দৃষ্টি। তাঁর গোঁয়ার একরোখা ছেলে আলমগীরকে দেখলেন। ঝাঁপিতে পোরা গোখরো সাপের মত উদ্যত ফণাটা নোয়ানো। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে ছেলেকে বিচার করলেন। যে জলের গভীর আবর্তে পড়ে জাহাজ ভেঙে খান খান হয়ে যায় তেমনি সখিনার শরীরের পাক খাওয়া আবর্তের মধ্যে পড়ে তাঁর গোঁয়ার ছেলেটি নির্জীব হয়ে পড়েছে। ছি! ছি! বাপ-বেটা দুজনকেই সখিনা তার শিকার বানিয়ে ছাড়ল?

সেদিনই ছেলেকে হলে পাঠিয়ে দিলেন। আর নিজেই সখিনাকে নিয়ে আধারাত জড়াজড়ি করে কাটিয়ে দিতে লাগলেন। কোন কথা শোনে না, কোন বারণ মানে না সখিনা। জামাল সাহেব তাঁর শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পৌরুষ দিয়ে সখিনার চোরা ক্ষুধা মিটাতে পারেন না। সেজন্য পালিয়ে পালিয়ে থাকতে চায়। চোখ লাল করে তাকালেই গলা চড়ায়। ইজ্জতের ভয়ে জামাল সাহেব সখিনার মুখে হাত চাপা দিতে বাধ্য হন। তখন সে কাঁদো কাঁদো গলায় গ্রামের সরলা অবলা কুমারী মেয়ের মত বলে ;

—'আপনি কেন আমার ধর্মডা নষ্ট কইরলেন।'

জামাল সাহেবের তখন বলার কথা কিছু থাকে না। বাধ্য হয়ে সখিনার কথামত কাজ করতে হয়। স্ত্রীর সঙ্কোচবশত যে আদর চাইতে পারেননি, সখিনা নেড়ে ঝেড়ে খুঁচিয়ে-খাঁচিয়ে সে আদর আদায় করে ছাড়ে। জামাল সাহেব দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দেন। রাতেরবেলায় বাঘিনীর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য

সমস্ত দিন ধরে নানারকম মতলব আঁটেন। রাতের অন্ধকারে সখিনা গুটি গুটি পায়ে শিকারি বেড়ালের মত এসে দরজায় ঘা দিলেই সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়।

সেদিন মসজিদে গিয়ে মৌলানা সাহেবের ঝাঁঝালো নছিহত শুনে জামাল সাহেবের মনে নতুন পরিকল্পনা জাগে। যিনি এমন জোরালো ভাষায়, এমন বেরহমভাবে বেপর্দা, বেশরম পর পুরুষের সঙ্গে যেনাকারী আওরতকে গালাগাল করতে পারেন, তিনিই সখিনাকে শিক্ষা দেবার উপযুক্ত লোক। মসজিদেই ঠিক করে ফেললেন, একমাস ঘর-বাড়ি মৌলানা সাহেবের এক্তিয়ারে রেখে গেলে সখিনার হাত থেকে বাঁচতে পারবেন। সখিনার বেশরম ভাবভঙ্গি কিছুতেই মৌলানা সাহেবের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।

বলতেই মৌলানা সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। মহল্লার মসজিদে ইমামতি আর আল্লাহর নামে হেদায়েত বর্ষণ করার পরও আয়ের পরিমাণ শ' কিংবা সোয়া শ'র ওপরে ওঠে না। বরঞ্চ জামাল সাহেবের বাড়ি তদারক করার দেড় শ' টাকার চাকরিটি পেয়ে খুশিই হলেন। জামাল সাহেবের মত একজন ধনবান এলেমদার মানুষকে নিজের দিকে টানতে পেরেছে দেখে হেদায়তের ওপর আস্থা অনেক গুণে বেড়ে গেল। দুই-তিন দিনের মধ্যে তার হাতে সমস্ত ভার গুছিয়ে দিয়ে খুলনার ব্যবসা দেখার অছিলায় বেরিয়ে পড়লেন। যাওয়ার সময় বলে গেলেন গোপনে

—'হুজুর, সখিনা চাকরানীটি বড় বজ্জাত আর বেশরম, পারেন তো তাকে বিদেয় করে জানাশোনা কোন ভাল মেয়েকে রাখবেন।'

—'এর জন্য বাবা ভাবতে হবে না। তার শয়তানী আর হারামিপনা আমি বের করেই ছাড়ব।' দাড়ি নেড়ে নেড়ে বললেন মৌলানা সাহেব।

দেড়মাস পর হেলিকপ্টার থেকে নেমে অনাস্বাদিত আনন্দ অনুভব করলেন জামাল সাহেব। এতদিনে বাঁচা গেল। উঃ কী সাংঘাতিক মেয়ে মানুষরে বাবা। শরীরের হাড়-মজ্জা পর্যন্ত শুষে নিয়েছে। বাড়িতে এসে তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। দেখেন সখিনা উঠোনে বসে মৌলানা সাহেবের পাকা চুল তুলে দিচ্ছে। তাকে আরো তেলাল চকচকে চেকনাইদার দেখাচ্ছে। সখিনাকে কিছু বলার সাধ্য তো নেই। মনে মনে তিনি মৌলানা সাহেবের উপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন। ব্যাটা এক নম্বরের ধাপ্পাবাজ। সখিনার মুখে ঝিকিয়ে উঠল সে হাসি, কুটিল হাসি, কালো জলের চোরা আবর্তের মত রহস্যময়। মানে, তুমি কি ভাবছ, তা কি আমি জানিনে?

সেদিনই মৌলানা সাহেবকে এক মাসের মাইনে দিয়ে বিদেয় করে দিলেন। ঠিক করলেন, জীবনে কোনদিন এ সমস্ত লম্বা জিভের মানুষদেরকে বিশ্বাস করবেন না। তারপর থেকে সখিনার সঙ্গে আবার পূর্বের মত জীবন শুরু করলেন। বিশ্রী মেয়ে মানুষটার মনে কোনরকম দয়ামায়া নেই। শারীরিকভাবে

তিনি যে অক্ষম তাও চিন্তা করে না। একটা চাকরানীর সঙ্গে প্রতি রাত স্ত্রীর মত সহবাস! আত্মীয়-স্বজনেরা কতবার বিয়ে করতে বলেছেন, মাথা নেড়ে না করেছেন। যদি এ খবর কোন ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় মুখ দেখাবেন কেমন করে? পর্বতপ্রমাণ অপরাধবোধের ভারে তিনি মুখ তুলে তাকাতে পারেন না।

এমনি সময়ে দেশ থেকে এলেন ছোট চাচা। জামাল সাহেব অকূলে কূল পেলেন। চাচার মত নারীবিদ্বেষী মানুষ জীবনে দ্বিতীয়টি দেখেননি। সামনে মেয়ে মানুষ থাকলে তাঁর ভাত খাওয়া হয় না। ছেলেবেলায় নিজের চোখে দেখেছেন চাচা নিজের হাতে লোহা গরম করে ব্যাভিচারিণী মেয়ে মানুষের কপালে দাগ দিয়েছেন। ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ গরম লোহার দাগ মাংস কেটে বসেছে। সুতরাং চাচার হাতে বাড়ি-ঘরের সমস্ত ভার গছিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলেন। যাওয়ার সময় সখিনা যে বজ্জাত সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন এবং পারলে তাকে ছাড়িয়ে অন্য কোন মেয়ে মানুষকে কাজে বহাল করতে বলে গেলেন।

আটাশ দিন পরে ফিরে এসে দেখেন, সখিনা চাচার সঙ্গে নানা নাতিনের সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়েছে। সখিনা ডাকিনী। তার সান্নিধ্যে এলে পুরুষ মানুষ ভেড়া বনে যায়। ঘোলা ঘোলা চোখের দৃষ্টি দিয়ে এ পর্যন্ত তিনজন সেরা নারীবিদ্বেষী পুরুষকে ঘায়েল করেছে! তার চোখে সে দৃষ্টি, মুখে সে হাসি। বুকে আগুন ধরায় না, ঢেউ জাগায় না। একটু একটু করে অজগরের শ্বাসের মত আস্ত মানুষটাকেই গ্রাস করে। পুরুষ মানুষের রস শুষে নিয়ে চরের দেশাল পাটের মত সজীব হয়ে উঠছে সখিনা। তার কালো রং দিন দিন চকচকে হয়ে উঠছে।

এবার মরিয়া হয়ে উঠলেন জামাল সাহেব, কিছুতেই তিনি বিশ্রী মেয়ে মানুষটাকে বুকে করে ঘুমোবেন না। মনে মনে শপথ নিলেন, তার মেছেতার দাগ ভর্তি গালে চুমো খাবেন না। কিছুতেই না। আধারাত বাইরে কাটান। বাড়ি ফেরেন শেষ রাতে। তখন সখিনা শিকারি বেড়ালের মত এসে হাজির হয়! জড়িয়ে ধরে। ডাকিনীর মত হাসে। জামাল সাহেব না করতে পারেন না। তাঁর শরীর নিয়ে আধারাত উল্লাস করে ডাকিনী!

এ বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় চিন্তা করছেন। আত্মহত্যার কথাটাও মনে হানা দিয়ে গেল। অসম্মানের চাইতে আত্মহত্যা ঢের ভাল। এ সময়ে তিনি পথ পেয়ে গেলেন। পেপারে বিজ্ঞাপন দেখে হজ্জের দরখাস্ত করে বসলেন। আত্মীয়-স্বজনেরা তীর্থযাত্রীকে দেখতে এসে মন্তব্য করলেন, তাঁরা টের পেয়েছিলেন, জামাল সাহেবের মনে ধর্মভাব অঙ্কুরিত হচ্ছে, সেজন্য বিয়ে করতে চাপাচাপি করেননি। পড়শিরা বলেন, একই কারণে তাঁরা জামাল সাহেবকে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান করলেন না।

মুণ্ডিত মস্তকে সাদা কাপড়ের পাগড়ি বাঁধা জামাল সাহেব থেমে থেমে বললেন,

'আমার সমস্ত স্বাদ, সমস্ত আহ্লাদ, কামনা বাসনার অবসান হয়ে গেছে।'

এই বলে তিনি কোমরে হাত রাখলেন। কোমরটা হঠাৎ বীর্যহীনতাবশত ব্যথিয়ে উঠল কি না!

সকলে হজ্জযাত্রী জামাল সাহেবকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখেন, গেটের গোড়ায় দাঁড়িয়ে সখিনা। রোদ লেগে মেছেতার দাগভর্তি গালজোড়া চকচক করছে। নারকোল তেল মাখা ভিজে ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর ঝাড়াঝাড়াভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। চোখে ঝানু কুমিরের মত ঘোলা ঘোলা উৎপাতা দৃষ্টি। ঠোঁটে জটিল কুটিল হাসি। যেন জামাল সাহেবকে বলছে নীরবে, 'এসবের অর্থ কি আমি বুঝিনে? কিন্তু আবার আসতে হবে ফিরে। এ দুই বাহু দিয়ে আবার আমি তোমাকে বাঁধব।'

কবি

'একটু সরে আসুন— এদিকে, এই যে স্যার এদিকে। আহ্ পাটা একটু টানুন, ধোয়া পাজামাটায় আবার কাদা লাগবে। সারাটা দিন কেমন কাঠফাটা রোদ। বিকেল বেলাটাতেই নেমে এল হঠাৎ বৃষ্টি। উহ্ ঝরছে কেবল ঝরছে, থামার নাম গন্ধ নেই। আসমানটা যেন ছেদা হয়ে গেছে। আহ্ ভিজে গেলেন যে, কোণার দিকটায় একটু সরে বসুন।'

তিনি খড়ের ছাওয়া চালের ফুটোগুলোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অসংখ্য ফুটোর ভেতর দিয়ে অসংখ্য ফোঁটা ঝরছে। বাইরের আকাশখানা একটানা কেঁদেই যাচ্ছে। হঠাৎ তিনি মূক হয়ে গেলেন। তাঁর হাড্ডিসর্বস্ব মুখমণ্ডলে জেগে উঠল গুমোট আকাশের মত একরাশ থমথমে স্তব্ধতা। পরক্ষণে, মেঘ চিরে যেমন বের হয় বিজলি, তেমনি বেরুল এক চিলতে হাসি। ঠিক হাসি নয়, কাঁদবার প্রয়োজন নেই বলে, দুই ঠোঁট ফাঁক করে বত্রিশ পাটি দাঁত দেখানোকে অভিধানগতভাবে কি বলা উচিত জানিনে, তিনি ঠিক তেমনটি করলেন।

'সাব অমন মুরগির মত আড়ষ্ট হয়ে রইলেন কেন, একটু পেছনে সরে পা দুটো ছড়িয়ে আরাম করে বসুন।'

কিন্তু পেছনে যাবটা কোথায়? তাঁর মতে, সামনে পেছনে নড়েবড়ে আরাম করে বসা আর বাইরে বৃষ্টিতে গিয়ে ভেজা একই কথা। পচা খড়ের চাল চুঁয়ে চুঁয়ে পচা পানি ঝরছে। ছিটকা এসে লাগছে গায়ে। ঘরের মেঝেটা বিশ্রী রকম স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠেছে। কোথাও একটু শুকনো নেই। বৃষ্টির পানি নালার আকারে গড়িয়ে যাচ্ছে। এবার ঝটতি আমার হাত দুটো ধরে টান দিলেন। বগলের তলায় একখানা হাড় মড়মড় করে বেজে উঠল। হেঁচকা টানে ছিটকে পড়লাম আমি। কেয়া পাতার চাটাইয়ের কোণা থেকে ধবধবে ইস্তিরি করা পাঞ্জাবিটার হাতায় একদলা তরল কাদা লেগে গেল। ভদ্রলোকের সেদিকে কোন খেয়াল খবর নেই। ভেটকি মাছের মত মুখখানা তেমনি ব্যাদান করে আছেন। ইচ্ছে হল কয়েক ঘা কষে লাগিয়ে দিই! শিরার রক্ত চন চন করে উঠল। বৃষ্টি বাদলে ঘরে ডেকে এনে পাঞ্জাবিটা আমার নষ্ট করে দিলেন। চিল্লিয়ে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, 'ব্যাটা পাঞ্জাবিটা আমার নষ্ট করলি কেন?' তিনি আমাকে কোণার দিকে দলামোচা করে বসিয়ে দিয়ে বললেন—

'এইখানে শুকনো আছে, আরাম করে বসুন। ওকি স্যার অমন কুঁকড়ে কেন, পা'টা ছড়িয়ে দিন পূর্বদিকে যতদূর যায়, চারদিকে বৃষ্টির মহাসাগর আর আমরা দুজন এক নিরাপদ আইল্যান্ডে। রবীন্দ্রনাথ যেমন গানে বলেছেন, "বৃষ্টিতে সারা পৃথিবীর বুকের একান্ত গোপন ভাষা অশ্রু হয়ে ঝরে", আমার ঘরখানাও বোবা বেদনায় চোখের জল ফেলছে। এ্যাঁ কি বলেন। তিনি হাসবার ভঙ্গিতে হাঁ করলেন। হাঁয়ের ভেতর দিয়ে আলজিভটা দেখা গেল পরিষ্কার। তারপর বাঁশের বেড়ার ওপারের কাউকে উদ্দেশ করে আখাউড়ার আঞ্চলিক ভাষায় বললেন—

'হুনছনি, আইজ ভাগ্য খুব ভাল গো। খুব নামী-দামি মানুষ একজনের পাকড়াইয়াছি। খুব ভাগ্য ভালা, নইলে তাইনের মতন মানুষের পায়ের ধুলাডা নি আমাগো বাড়িত পড়ে? দেহি এক চিলিম তামুক সাজো। আগুনটা তাজা কয়লার দিবা কিন্তু।'

ভেতর থেকে তামাকের মাটির হাঁড়িটা থপ করে এসে কাদার উপর পড়ল। ভেঙে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কাদার মধ্যে পড়ায় কোণাটা শুধু কাদার ভেতর চেপে বসে গেছে। আমি চোখ পাকিয়ে হাড়িটাকে দেখছিলাম। তিনি বলে উঠলেন—

'দেখলেন তো হাঁড়িটার আয়ু? কথায় বলে রাখে আল্লা মারে কে? গিন্নির রোষ থেকে বেঁচে গেল বেমালুম।'

যেন জীবন্ত কোন কিছুর গায়ে হাত বুলাচ্ছেন, তেমনি সস্নেহভাবে হাঁড়িটার গায়ে হাত বুলালেন কয়েকবার। তারপর গিন্নির উদ্দেশে বিড়বিড় করে বললেন—

'তামাক নেই, তা আগে বলতে হয়। দোকান থেকে নিয়ে আসতাম। ঘরে মেহমান এলে কি তেমন করতে আছে? রাগ চণ্ডাল। মাথায় চড়লে উঁচু নিচু খেয়াল থাকে না। পাগল, আস্ত পাগল নিয়েই ঘর করছি আমি।'

কথাগুলো বলে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকালেন, যেন আমিও বলি, হ্যাঁ আস্ত একটা পাগল নিয়েই ঘর করেন বটে আপনি।

'ঠিক আছে হাজেরার মার কাছ থেকে দু চিলিম ধার নিয়ে আসি। হাজেরার মার কাছে না পাই তো দু কদম দিয়ে দোকান থেকে দুদলা কিনে আনব।'

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ধারাকে পরোয়া না করে উঠানের মধ্যদিয়ে হাঁড়িটা হাতে বেরিয়ে গেলেন।

বসে বসে আর কি করি। পচা খড়ের চাল থেকে চার-পাঁচটা কেঁচো ঝরে পড়েছে। সেগুলো কিলবিল কাদায় থিকথিক করছে। একটা চাটাই বেয়ে উঠে এল উপরে। সারা গা ঘিন ঘিন করে। ম্যাচের কাঠি দিয়ে ছুঁড়ে দিলাম বাইরে। এ পরিবেশে থেকেও মানুষ কবিতা লেখে! আমার বন্ধু-বান্ধব আছে অনেকে

বস্তুবাদী সাহিত্যিক হিসেবে বাজারে নাম কিনেছে। কিন্তু এরকম জীবন্ত বাস্তবের কথা চিন্তা করলেও তাদের হাত থেকে কলম খসে পড়বে।

চোখ তুলতেই দেখলাম বেড়ার বিরাট ফাঁক দিয়ে একজোড়া কৌতূহলী চোখ আগ্রহ সহকারে দেখছে আমাকে। না দেখার ভান করে আমিও চোখ দুটোকে আগ্রহসহকারে দেখতে লাগলাম। বুঝতে পারলাম, ইনিই আমাদের কবি নুরুল হক সাহেবের গিন্নি। দেখতে লাগলাম সে দুটো চোখ মায়াহীন, মমতাহীন, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ। তেঁতুল কাঠের কয়লার মত ধিকি ধিকি জ্বলন্ত। দুর্বোধ্য প্রশ্ন দুটো চোখে বারবার ঝিকিয়ে উঠছে। ভারে বারবার ভেঙে পড়ছে ঋজু দৃষ্টিরেখা। দুটো চোখের মণি চাপা বেদনায় কঁকিয়ে উঠছে যেন।

বাইরের বারান্দায় একটা ছাগলছানা বারবার ম্যা ম্যা ডাকছে। বেচারি মাঠ থেকে ভিজে ভিজে এই মাত্র এসেছে। চুপসে গেছে সারা শরীর। একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে বারবার তাড়া করছে। ছাগলছানাটি শিশু শিং দুটো সামনে পেতে দিয়েও নিরাপদ না ভেবে ম্যা ম্যা ডাকছে।

'দূর ছেই, মরার কুত্তা ছাগলডারে কামড়াইলে তোর লাভ?'

ওপাশ থেকে চনচনে কণ্ঠ বেজে উঠল। সেও এক আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। নারীর স্বাভাবিক মিহি কণ্ঠে বেদনার ঢেউ আর তাতে যদি মেশানো থাকে ক্ষোভ আর আক্রোশের ধারাল রেশ— ঠিক তেমনটি। কাঁচের কুচির মত। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি ঝরছে। ঘরের ভেতরের বিষণ্ন নিস্তব্ধতা কুচি কুচি করে ভেজে ওঠে কবি গিন্নির কণ্ঠস্বর। আমি উঠে ছাগল ছানাটার কাছ থেকে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিলাম।

'আপনে কষ্টডা কইরলেন।'

আবার বেজে উঠল সে কণ্ঠ, কাঠিন্যটুকু বাদ দিলে কবিরা যে কণ্ঠের সঙ্গে রিমিঝিমি সুরের তুলনা করে কবিতা লিখবেন।

'না ভাবী, কিচ্ছু না', অজান্তে ভাবী ডেকে ফেললাম।

'কি যে কন। আপনেরা শহুইর‍্যা মানুষ। গাড়ি ঘোড়ায় চলেন। গরিবের ঘরত ভাগ্যগুণে ধুলা পইড়ছে। ভালাভাবে একটু বসাইবার ক্ষ্যমতা নি দিছে আল্লাহ্। ঘরের মানুষডাও পাগল। দিনের বেলা ইস্কুলে যায়, রাতের বেলা খালি লেখা বানায়; লেইখ্যা কি অইবো কন?'

সত্যিই তো লিখে কি হবে? কবিগিন্নির কথার জবাব দিলাম না।

কবি গিন্নি এবার পাশে সরে এসেছেন। মুখটা দেখা যাচ্ছে। রোগ, শোক, অভাব, দুঃখ কিসের যে স্বাক্ষর আঁকা নেই বলা কঠিন। এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন। সৌন্দর্যের বিধ্বস্ত বিদিশায় দারিদ্র্য, দুঃখ শিকড় গেড়ে বসেও শুষে নিতে পারেনি সবটুকু। ক্ষীণতম রূপলাবণ্যের অবশেষে এখনো স্নিগ্ধশিখায় জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে। দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে কিন্তু আচ্ছন্ন করে না। কবিগিন্নির কাঁধ বেয়ে শাড়িখানা ন্যাকড়ার মত ঝুলে আছে। কাঁধ নাড়ার

অবসরে অভাবের বিজয় পতাকার মত দুলে দুলে ওঠে। অভাবের অগ্নিকুণ্ডে তিলে তিলে আত্মবিসর্জন দেওয়া নারীরও এক জাতীয় স্বকীয় মহিমা, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে বৈকি। কপালে দুটো চোখ থাকলে তাও দেখতে হয়, অন্তরে শিল্পীসুলভ অনুভূতি থাকলে শ্রদ্ধাও জানাতে হয় অন্তর দিয়ে। আমি বললাম—

'তিনি বলেন আপনি পাগল, আপনি বলেন তিনি, কার কথা বিশ্বাস করি।'

'দুজনের কথাই হেঁছা ভাই, হে স্বভাবের পাগল আর আমি আইলাম অভাবের পাগল।'

হ্যাঁ, অভাবে মানুষ পাগল হয়, স্বভাবের মধ্যে অভাববোধ থাকলেও মানুষ পাগল হয়। কত সত্য চূড়ান্ত বাস্তব— স্বভাবে মানুষ পাগল, অভাবে মানুষ পাগল।

তারপর কবিগিন্নি ঘরের বৃষ্টি প্লাবিত মেঝের দিকে এক দৃষ্টে তাঁর তীক্ষ্ণ চোখজোড়া মেলে ধরলেন। ধীরে ধীরে দৃষ্টির ধারটুকু মুছে ঝাপসা হয়ে এল দুটো চোখের। মুক্তার বিন্দুর মত দুই ফোঁটা অশ্রু জমে উঠল। আকাশজোড়া বৃষ্টির পানিতে সে দুটো ফোঁটার তুলনা নেই। হঠাৎ চমকে উঠে আঁচলের খুটে চোখ মুছে নিয়ে হেসে উঠতে চাইলেন। কীটদষ্ট শিউলি ফুলের মালার মত বিবর্ণ সে হাসিরেখা।

—'কি ভাবী, হাসছেন যে?'

—'না, আমি এমনি।' একটি নিশ্বাস নীরবে হাওয়ার শরীরে বিঁধিয়ে দিলেন।

বাইরে বৃষ্টি কমেছে। উঠোনের সজনে গাছটার পাতা থেকে টপটপ চোঁয়ানো জল ঝরছে। কবি সাহেব উঠোনের মাঝবরাবর হেঁটে ঘরের দাওয়ায় উঠে এলেন। জায়গায় জায়গায় ছড়ে যাওয়া ভেজা পাঞ্জাবিটা সারা গায়ের সঙ্গে সাপটে ধরেছে। আধ ময়লা লুঙ্গিখানার অবস্থাও একই রকম। সেদিকে তার খেয়াল নেই। আমাকে লক্ষ্য করে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বিনীতভাবে বললেন :

'ইস আপনাকে ডেকে এনে এতক্ষণ একা একা বসিয়ে রেখে ভারি অন্যায় করে ফেলেছি।'

পরক্ষণেই ঘরের বেড়ার ওপারকে উদ্দেশ্য করে আঞ্চলিক ভাষায় বললেন :

'হাজেরার মা দিল না, একেবারে দোকান থে লইয়া আইলাম। দু দলা খাঁটি মতিহারী। বিষের মত। রং দেখ না কেমন চকচকাইয়া জ্বলে, বিষের নাহান। আগের ছ আনা অক্ষণে দুই আনা মোটমাট আষ্ট আনা অইল বাকি। কাইল পরশু দিয়ে দেমুনে। কি কথা কওনা ক্যান।' বলে বেড়ার ওপারে চলে গেলেন।

কবি সাহেবের কথা শেষ হবার সঙ্গে ঝংকার দিয়ে বেজে উঠল মিহি কণ্ঠ।

'আগের কীয়ের বাকি?'

'ক্যান তরকারি আইনছিলাম হেইদিন।'

'আণ্ডা বেচা হগল পৈসা না তুমি নিলা?'

কবি নুরুল হক বিচিত্র ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলেন। বেড়ার বিরাট ফাঁকটা দিয়ে দেখা যায় কেমন একটা হিংস্র বিষণ্ন জীবন্ত ছায়া কবিগিন্নির মুখমণ্ডলখানিকে ঘিরিয়ে জেগে উঠছে।

'যা হোক, ভাগ্যটা ভাল বৃষ্টিটা থামছে।' নারকেলি হুকার কল্কিতে জ্বলন্ত নারকেলি ছোবড়ায় ফুঁ দিতে দিতে মন্তব্য ঝাড়েন। হুঁকোটা আমার হাতে দিয়ে বললেন।

'এইদিকে আসুন, দেখুন, শহরে মাথা খুঁড়লেও এমন সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাবেন না।'

এগিয়ে গেলাম। শুধু পাথরে মাথা খুঁড়লেও নয়, আস্ত জানখানা কেটে দিলেও দেখতে আমি পাব না। কচি কচি পাটের চারায় বৈকালিক মেঘভাঙা সূর্যের চারিয়ে যাওয়া রং, নিতল জলের আরশি, ঘনপাটের আন্দোলিত শীর্ষদেশ। আমি এ তল্লাটে পাটের দেশে নতুন বলে এসব হয়ত আমার চোখে কিছুটা কাঁচা সোনার অঞ্জন মাখিয়ে দেয়। কলকারখানার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চোখ দিয়ে দেখি বলে সুন্দর লাগে। কিন্তু এ লোকটা জীবনের চল্লিশটি বছর ধরে উদয়াস্ত এ দৃশ্য দেখছে। তারপরে কেমনে আকুল আগ্রহভরে নিজে দেখে, পরকে দেখিয়ে বলে দেখুন কেমন সুন্দর। কোথাও আপনি এমনি একটি দেখতে পাবেন না। মানুষের সৌন্দর্যচেতনার পরমায়ু কতদিন?

নারকেলি হুঁকোটায় দুটো টান লাগাতেই গলায় উঠে এল এক ঢোক ঝাঁঝালো পানি। হুঁকোটা কাদার উপর শুইয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেললাম।

কবি গিন্নি সঙ্কোচের শেষ বালাইটুকু ঝেড়ে ফেলে বাইরে চলে এলেন। কবি সাহেব ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। মুখে রাটি নেই।

'নিজে ত বিষ খায়। মাইনসেরেও খাওয়ায়। মাথাডা ঘুরায়নিহি ভাইজান, একটু তেতুল চুইষ্যা খান, অক্ষণে কমবো।'

মাথায় তেমন কিছু হয়নি। কুলি করে উঠে বসলাম। আমার অবস্থা ভাল দেখে কবি সাহেব আমার মুডে চলে গেলেন— 'দেখলেন তো স্যার, আমার ওয়াইফ কেমন ফরওয়ার্ড। সব ঠিক থাকলে চুপচাপ ঘরের কোণায়, কথাটি নেই। যেই বেগতিক, অমনি হাজির একাই একশ'।'

তিনি এমন আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন যেন আমি পারমিশন দিলে এখ্খুনি একটা চুমু খেয়ে ফেলবেন।

একটু পরেই কোণা ভাঙা শ্লেট এবং ছেঁড়া বই হাতে দুটো ছেলে উঠে এল। তাদের দিকে তাকিয়েই কবি সাহেব একবাক্যে বলে দিলেন।

'তোরা আইজ যা, বাড়িতে মেহমান আইছন। কাম আছে। আইজ পড়াইতে পারতাম না।'

ছেলে দুটোর মধ্যে বড়টা উঠোনে নেমে ছোটটাকে বলল—

'পাগলা আইজ তামাম রাইত ভইরা চিল্লাইবো। তার পির ছাব আইছন।' কবি সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন।

'খাড়া হারামজাদা মাথাটা টাইন্যা ছিঁইড়া ফেলি।'

'ইস ফুটানী, কাইল থনে আর আমু না। মাসের শেষে পৈসা আনতে গেলে তর মাথা ছিঁড়ুম।' বলে দৌড়ে পালাল।

'দেখলেন কী বেতমিজ? কী বলে গেল? কথাগুলো জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কোথায় যেন আটকে গেল কণ্ঠস্বর। যে পীড়িখানার উপর বসেছিলেন তা যেন সাত হাত মাটির গভীরে সেঁধিয়ে গেল। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। ঘষা কাচের মত চোখের মণি দুটো বাইরের দিকে প্রসারিত। যেখানে কচি পাটের ডগায় সূর্যের রং ফলেছে, যেখানে নিতল জলে বিশাল আকাশ স্বচ্ছ সুন্দর ছায়া মেলে দিয়েছে, সেখানে কী খুঁজেছেন তিনিই জানেন।

কবি গিন্নি আমাদের সামনে দিয়ে বাইরে যাবার সময় তীরের মত ধারালো দৃষ্টির ফলায় তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন। কপালে করাঘাত করে উচ্চারণ করলেন—

'যদি আল্লায় পথ খোলা রাইখতো এই কলসি গলায় না বাইন্ধ্যা জন্মের মতন ডুইবা মইরতাম। জগৎ সংসারের কেউ যেন আমার মুখ দেখতে না পায়। লজ্জাসরম নি আছে? মা-বাপে ঝাল মরিজ খাই নি জনম দিছিল।'

কবি নুরুল হক সাহেব হঠাৎ সজারুর মত সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। থিকথিকে মেঝের ওপর দিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন সোজাসুজি। তারপর আমার মুখের দিকে তাকালেন। তার দৃষ্টি খরতীক্ষ্ণ। তাতে একটা গতি বিদ্যুতের বর্তনীর মত ঘুরছে রেখায় রেখায় রেখায়িত হয়ে। গিরগিটির মত শরীরখানার বাঁধন ছিঁড়ে উত্তপ্ত জ্বালাময়ী হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে এসে বেরিয়ে পড়তে চায় বুঝি। সূর্যাস্তের পূর্বে আকাশের মেঘের মানচিত্রে যে পুঞ্জ পুঞ্জ সিঁদুরে মেঘের মিনার জমে তেমনি রক্তিম, তেমনি নতুন হৃদয়ের রঙের বাক্সের সবটুকু ঢেলে দেবার মত উত্তেজনা। তার ধমনীর কিনারে কিনারে আছড়ে পড়ছে রক্তের শানিত আক্রোশ।

'আমার একটা কবিতা শোনবেন এখন?' কোন ভূমিকা নেই। আমি তাঁকে বোঝালাম। আমার গাড়ির এখনো অনেক দেরি। সে রাত তিনটেয়। বলতে গেলে মাঝখানে গোটা রাত। কবিতা শোনার ঢের অবসর। ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেলেন।

এরপরে আমি একজনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে চলে এলাম। কথা দিলাম রাতে তাঁদের বাসায় যাব। কবিগিন্নি সজলকণ্ঠে মিনতি জানিয়ে বললেন—

'ভাই ছাব আইজ গরিবের বাড়িতে ভাতে ভাত দুইটা খাইয়া যাইবেন।'

আমি কথা দিয়ে চলে এলাম। সজনে গাছটার কাছে এসে পেছন ফিরে দেখি একটা জং ধরা টিনের তোরঙ্গ খুলে কবি সাহেব তছনছ করে কি যেন খোঁজাখোঁজি করছেন। আর কবিগিন্নি অধোমুখে দাঁড়িয়ে। তার চোখ থেকে টসটস জল ঝরছে।

এই আমার কবি নুরুল হক চৌধুরী। তাঁর সঙ্গে পরিচয় আমার তিন মাসের বেশি নয়। আসাদ ভাইয়ের সঙ্গে এই গাঁয়ে একবার সাহিত্য সভায় এসেছিলাম। রেলস্টেশন ছাড়িয়ে বাঁকা পথে কিছুদূর গেলে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। সেখানে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে আমিও একখানা ভাঙা চেয়ারের অর্ধাংশ পেয়েছিলাম। বাকি অর্ধাংশে বসেছিলেন এমন একজন, যাঁর চেহারার বর্ণনা রুশীয় ঔপন্যাসিক দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে কদাচিত মেলে। অগ্নিপিণ্ডের মত গনগনে লাল দুটো চোখের তারা। হাত পাগুলো কাঠির মত। শরীরে কাপড়-জামা এমন শ্রীহীন বেখাপ্পাভাবে ঝুলে আছে, দূর থেকে দেখলে মনে হবে খড়ের অপটু হাতের গড়া মূর্তিকে কেউ যেন বিদ্রুপ করে ঢোলা কাপড়-জামা পরিয়ে বসিয়ে রেখেছে। হাতে রুল করা চৌষট্টি পৃষ্ঠার একখানা ডবল সাইজের একসারসাইজ বুক কোলের কাছে ধরে রেখেছেন। সময়ে সময়ে কোন কোন পৃষ্ঠা খুলে খুলে পড়ছেন। ঘোষকের দিকে একটা কান সব সময় উৎকর্ণ করে রেখেছেন। কোরআন পাঠ, জাতীয় সঙ্গীত, দুটো লারেলাপ্পা জাতীয় গান, একটা ধিঙ্গি মেয়ের ধেই ধেই নাচের শেষে ঘোষক ঘোষণা করলেন— এবার স্বরচিত কবিতা পড়বেন 'জনাব নুরুল হক চৌধুরী।'

—সভার ছেলে বুড়ো একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'না না।'

পেছনের একজনকে বলতে শোনলাম—

'শালা নুরাইয়া নাকি আইজ কবিতা পড়বো বুইল্যা একমাস যাবত না ঘুমাইয়া খালি লেখছে। লেইখ্যা লেইখ্যা সব নাকি সব ঐ খাতাটার ভিতর থুইছে।'

আরেক জন বলল, 'খাতাডা আমার দোকান থনে বাকি নিছে, অক্ষণো পৈসাও দেয় নাই। ঠিক আছে তারে আজ পড়বার দিমু না। যহন পড়বো যুর কইর‍্যা চিল্লাবো। কি কস।'

'হ হ ঠিক।'

কবি নুরুল হক চৌধুরী মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দুহাতে কবিতার খাতাটা তুলে পড়তে লাগলেন। সভার সকলে ভয়ঙ্কর চেঁচামেচি করছে। তিনিও প্রাণপণে চিৎকার করছেন। তাঁর চিৎকার এবং শ্রোতাদের চিৎকারে সভাগৃহ বাজারের মাছের দোকানে পরিণত হল। আমার ডানপাশের ভদ্রলোক হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দুটো ছেলের হাত দুহাতে ধরে মুখ নেড়ে বলতে লাগলেন—

'মিটিংয়ের চাঁদা দিছি আমরা। আমরার ছেলে-মেয়ে কি পুরস্কার পাইল তাড়াতাড়ি না দিয়া এক পাগলারে দিয়া হগলে পাগলামি শুরু কইর‍্যা দিছে। থাকতাম না।'

তাঁকে মিনতি করে বসাল ভলান্টিয়ারেরা। নুরুল হককে যতই মাইক ছেড়ে দিতে বলে ততই চড়াস্বরে উচ্চারণ করেন— নির্বিকারভাবে পড়ে যাচ্ছেন। পৃথিবীর মানুষের সামনে নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার যেন এই প্রথমবার পেলেন। হঠাৎ একজন ছোকরা ভলান্টিয়ার গালে ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মাইকের সামনে থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিলেন।

নেমে এলেন নুরুল হক। অপমানে ক্ষোভে ধিক্কারে, ক্ষয়ে যাওয়া কৃষ্ণ পাথরের মত মুখখানা এই প্রথম লাল হয়ে উঠল। এক হাতে খাতাটা অন্য হাতে ভাঙা চেয়ারের হাতলখানা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। পৃথিবীটা কি দুলছিল? যথারীতি পুরস্কারবিতরণী সভা শেষ হয়ে এল। সেই থেকে কবি সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়।

সভার শেষ হলে স্টেশনেরই এক রেস্তোঁরায় তাঁকে নিয়ে গেলাম নিজের গরজে। খাতাটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে পড়ে দেখলাম। কবিতা হয়নি একটাও। কোনটাতে জসীমউদ্‌দীনের ভাষা, কোনটাতে নিম্নশ্রেণীর স্কুলপাঠ্য বইয়ের কবিতার ছাপ ঘনিষ্ঠ। কিন্তু ইনিয়ে বিনিয়ে দুঃখের কথাগুলো বলেছেন নিজের। তাঁকে বুঝালাম, 'দুঃখটা কবিতা নয়, দুঃখের অধিক দুঃখ, আনন্দের অধিক আনন্দ না থাকলে কবিতা কবিতা হয়ে ওঠে না।'

—'দুঃখের অধিক দুঃখ কি আমাকে বোঝাতে পারেন?' ফস করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

—'যাতে সব মানুষের অন্তরের গভীর দুঃখ ভাষা পায়। একজনের দুঃখে সমগ্র মানুষের মনে দুঃখবোধ জেগে ওঠে'— বললাম আমি।

—'একজনের দুঃখে কি সব মানুষের মনে দুঃখবোধ কখনো জাগে? আমাকে চড় মেরে অপমান করল, তাতে সব মানুষ দুঃখিত হল? কই কেউ তো প্রতিবাদ করল না। এর চেয়ে অধিক দুঃখ কি আমাকে বুঝিয়ে বলুন। এর চেয়ে অধিক দুঃখ আর পৃথিবীতে আছে?'

'এই রকমের দুঃখকে আপনি ভাষা দেন না কেন? যে ভাষায় আপনার মন কথা কয়, অপমানিত হওয়ার পর প্রতিশোধ স্পৃহায় মন যখন পাগল হয়ে উঠতে চায়। মনের সে জ্বলন্ত আগুনের ভাষারূপ দেন না কেন?'

'ঠিক আছে এবার প্রতিবাদের পালা। খুনকা বদলা খুন।'

চৌষট্টি পৃষ্ঠার খাতাখানা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে চায়ের চুলোর ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। আগুনের শিখা পাতাগুলোকে নিঃশেষ করছে একে একে। সরু হাতখানা তলোয়ারের ফলার মত আন্দোলিত করে, মুঠি বাগিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে উচ্চারণ করলেন, ঠিক আছে, 'এবার খুন কা বদলা খুন।'

তিনিই আমার কবি নুরুল হক চৌধুরী! আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা দিয়ে চলে এসেছিলাম অন্য দরকারে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন। এই কবি নুরুল হকের কথা শুনে আমার এক ধনী শহুরে বন্ধু গালে সাবান ঘষতে ঘষতে কেঁদে ফেলেছিলেন।

সে রাতে কবি সাহেবের বাসায় খেলাম। লোকটার একটা বউ আছে বলেই বোধহয় সংসারে বেঁচে আছেন। ভাতে ভাত নয়, অনেক কিছু খেলাম। বেশ পরিতৃপ্তি সহকারেই খেলাম। কবি সাহেবের মুখে চাপা বিদ্যুতের বর্তনিটি এখনো স্থির আছে। আমার মনে হল যুগ যুগ ধরে সাধনা করে আদিম বন্য হিংস্রতার পুষ্পটি ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। সে চোখের সঙ্গে একমাত্র ঘাতকের রক্তমাখা ছুরির তুলনা হতে পারে।

টিনের জং ধরা তোরঙের ডালা খুলে একতাড়া কাগজ টেনে আনলেন। তাড়া খুলে একটা লেখার ওপর বারবার চোখ বোলাতে লাগলেন। মুখে বিড় বিড় করে কী যেন বললেন।

নরবলি দেওয়ার আগে কাপালিকদের মুখের ভাষাও বুঝি অমনি করে ঝিকিয়ে ওঠে। এক সময় তিনি হনহনে গলায় চিৎকার করে উঠলেন :

"আমি এক নির্মম পথিক এই পৃথিবীতে
আমার অন্তর ভরা তীব্র হলাহল
বেদনা যাতনা মাখা দুঃসহ অনল
তরল রক্তের স্রোতে লোলুপ রসনা;
তীব্র রোষে কয় মোরে ক্ষমা করিব না।
পৃথিবীর পথে পথে হৃৎপিণ্ড ঘষে ঘষে
আমি লিখে রেখে যাব
    দুর্জয় বাসনা অগ্নি তোমারে প্রণাম
ফুলের বোঁটায় তুমি রঙ্গিলা মাধুরী
আমার অন্তরে হয়ো চেতনার ছুরি
    আমি যেন হত্যা করি
    পশু হত্যা করি
জীবনের মুক্তি লক্ষ্যে মারি কিংবা মরি।"

একটার পর একটা অনেকগুলো কবিতা তিনি পড়লেন। আমি হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। কান্না জমে জমে কঠিন হয়ে কেমন চকমকির শিখার মত ঠিকরে ওঠে। আমার রক্তেও আগুন লাগছে। একজন মানুষের বুকের গভীরে এত আগুন— এত আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে?

আমি কবিতার খাতাটা আনতে চাইলাম, বেছে বেছে কিছু কবিতা কোন বন্ধুর মাসিক কাগজে ছাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি বললেন—

'একি ছেপে পণ্য করার জিনিস? আমার তেজ, আমার বীর্য, আমার আকাঙ্ক্ষা সবকিছু পঙক্তিগুলোতে আমি মিশিয়ে দিয়েছি।' আপনি কি তা সুখী মানুষদের হাতে তুলে দিয়ে মাটি করতে চান? রেখে দিন, যাদের জন্য লিখেছি, ঠিক তাদের হাতে পারলে তুলে দেব, নয়ত এমনি নষ্ট হবে।'

—'কেউ ভালা কইত না তোমারে, কেবল আমারে জ্বালাইয়া মারলা আর নিজেও জ্বইল্যা পুইড়া মরলা। কবিগিন্নির দুচোখে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু।'

সে রাতে ট্রেনে করে ফিরে যেতে দেখলাম চারদিকে অন্ধকার। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। তালোয়ারের মত আমাদের ট্রেনখানা আলো ছড়িয়ে অন্ধকারকে ফালি ফালি করে কেটে সামনে ছুটছে। অতল অন্ধকারে সারা দেশের গোঙানি খনির বুকে হীরের মত কঠিন হয়ে জমছে। আকাশের তারার ঋষিদৃষ্টি কাঁপছে অন্ধকারের শিয়রে। হঠাৎ কবির কবিতার একটি পঙক্তির কথা খেয়াল হল। 'মারি কিংবা মরি'। বারবার উচ্চারণ করলাম। কামরা ভর্তি সহযাত্রীদিগের পানে তাকালাম। তারাও সকলে চোখমুখ বন্ধ করে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একই কথা ভাবছে, 'মারি কিংবা মরি।' উপরের নক্ষত্রের আলোতে তারি স্বীকৃতি ঝরে পড়ছে।

হাত

ইস্টবেঙ্গল সিল্ক ইন্ড্রাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেব ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো দেখছিলেন। ফ্যাক্টরি ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্ট আর ডিলারদের কোটা বাড়াবার অনুরোধে মাথার মগজ ঝাঁ ঝাঁ করছে। একটা মোটা হাভানা চুরুট ধরিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। স্প্রিংয়ের গদি আঁটা চেয়ারে শিরদাঁড়া সোজা করে নড়ে চড়ে বসলেন। পরক্ষণে চিঠিপত্রের স্তূপের মধ্যে পুরু একটি প্যাকেটের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হল। কৌতূহল বশে তিনি প্যাকেটটা টেনে নিলেন। উপরে নাম লেখা মুবিনুল ইসলাম। তাঁর অফিসেরই এক কেরানি। উপরের মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললে বেরিয়ে এল একখানা সাময়িক পত্র। মলাটের উপর লাল কালিতে নাম লেখা মাসিক 'সংরাগ'। নিচে ছোট অক্ষরে বাঁকা ছাঁদে লেখা সম্পাদকের নাম।

আনোয়ার আজিম সাহেবের শরীরে খেলে গেল একটা মৃদু শিহরণ। স্মৃতিতে লাগল প্রবল ঝাঁকুনি। ছাত্রজীবনে এমনি একখানা সাময়িক পত্র হাতে তুলে নেবার সময় অব্যক্ত আনন্দে কেমন করে নেচে উঠত মন। দিন গিয়েছে, অবস্থা পাল্টেছে। পঞ্চাশের বামদিকে বয়েস। তবু স্বভাবধর্ম ভোলেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় শনিবারের চিঠি ছেপেছিল তাঁর একটা কবিতা। পাতা উল্টে নিজের লেখা ছাপার হরফে দেখে তৃতীয় বর্ষের তরুণ ছাত্র আনোয়ার আজিমের হাড়ে মাংসে জেগেছিল ভূমিকম্পের মত অনুভূতি। ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারেননি, বুদ্ধি দিয়েও বিশ্লেষণ করতে পারেননি সেদিন— পারবেন না কোনদিন। যে মেয়েটি নীল কাগজে মধুর মধুর কথা ভর্তি করে আশ্চর্য, অপরূপ জগতের গোপন দরজা খুলে দিয়েছিল একদিন সে এসেছে ঘরণি হয়ে। তার মাজা মাজা গৌরবর্ণ দীঘল ছিপছিপে শরীরে ক্লান্তি, দুর্বলতা, বিষণ্ণতার মত নেমেছে মেদ। কত অল্পেই শরীরে সঙ্গীত ঝরার ঋতু ফুরিয়ে যায়। কত সংক্ষিপ্ত এ জীবন। তবু পৃথিবীতে অক্ষুণ্ন থাকে আশ্চর্য আর অপরূপ। বুকের ভেতর আশ্চর্যকে ধারণ করে ছন্দিত বেহালার মত কেমন করে প্রকাশের বেদনায় কেঁদে ওঠে জীবন। এখনো পৃথিবীতে আশ্চর্যের রঙিন চিঠি সাময়িকপত্র ডাকঘরের পথে হেঁটে হেঁটে বাড়ি গিয়ে আসর জমায়। ব্যবসা, বাণিজ্য, হিসেব-নিকেশ তুচ্ছ মনে হল। মনে হল সমস্তটা জীবন ধরে কেবল জঞ্জালই বাড়িয়ে চলেছেন।

পাতা উলটিয়ে পয়লা লেখাটির উপর চোখ দিলেন। শিরোনাম 'অনির্বাণ'। লেখক মুবিনুল ইসলাম। ছেলেটা তাহলে গল্প লেখে। লেখার রোগ না থাকলে কি আর সাধারণ যোগেও ভুল করে? এই তো সেদিন ডেকে ধমকে দিয়েছেন। হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন, এরকম ভুল আর কোনদিন হলে চাকরি থাকবে না। স্বভাবে লেখক, পেশায় কেরানি। ঠোঁটের কোণায় একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা জেগে মিলিয়ে গেল। তিনি লেখাটার ওপর চোখ বুলাতে থাকলেন। কিছুদূর দেখে ফেলে রাখতে পারলেন না। প্রতিটি শব্দ কলরোল করে শীতল বিজলির আলোর মত চেতনায় ছড়িয়ে পড়ে। মনের তলা ফুঁড়ে জেগে ওঠে অনাস্বাদিত আনন্দের বুদবুদ কণা। দু পৃষ্ঠা পড়ার পর চুরুটে টান দিলেন। নিভে গেছে। হাতের কাছে অ্যাশট্রে খুঁজে না পেয়ে ছুঁড়ে দিলেন মেঝেয়। একেকটি কালো হরফ মনের তন্ত্রীতে কেমন সূক্ষ্মভাবে রণিত হয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিনানো রাগিনির মত। একশ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাস মাইনের মাস্টারের জীবনকে যে এত সুন্দর হৃদয়গ্রাহী করে আঁকতে পারে, তার নিশ্চয়ই ক্ষমতা আছে। মাস্টারের মৃত্যু কী সুন্দর! সাধারণ লোকে বলবে পাগলামো। ছাত্রদের নিয়ে বর্ষার ভরা নদী পার হচ্ছিলেন। মাঝগাঙে ডুবল নৌকা। সব ছাত্র সাঁতরে ওপারে চলে গেল। মাস্টার মশাইও সাঁতার কেটে কিছুদূর গেলেন। হঠাৎ খেয়াল হল মুসলিম সাঁতার জানে না। কি করে তার বাবাকে মুখ দেখাবেন? সুতরাং আবার মাঝগাঙে ডুব দিলেন। ভেসে উঠলেন। মাঝিকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, 'মুসলিমকে পেয়েছ?' আবার ডুব দিলেন। দুদিন বাদে দু' মাইল দূরে চরের কাছে ছাত্র-শিক্ষক দুজন জড়াজড়ি করে ভেসে উঠেছে। জড়াজড়ি করা দুটি মৃতদেহ তাঁর চোখের সামনে যেন ভাসছে। কলকাতার ছাত্রজীবনে একটি নিষিদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে আনোয়ার আজিম সাহেব সভায় যেতেন। আত্মত্যাগের আদর্শ স্থাপন করার জন্য এরকম একটি মহৎ মৃত্যুকে তিনিও কামনা করতেন।

কিছুক্ষণের জন্য তিনি গুম হয়ে রইলেন। অনুভূতি যন্ত্রটা বিকল হয়ে গেছে। সুইং ডোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর স্পেশাল স্টেনো মিস ফিলবি গানের মত ভাষায় ভেতরে আসার অনুমতি চাইল। 'মে আই কাম ইন স্যার।' বিরক্ত হলেন তিনি। নো। অজান্তেই কণ্ঠস্বরে কঠোরতা বেরিয়ে এল। অন্যান্য দিন মিস ফিলবির প্রতি বেশ সদয় ব্যবহার করেন। মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে লাঞ্চেও যান। ম্যানেজার এসে জানালেন বিনীতভাবে—

'স্যার ডেপুটি সেক্রেটারির টেলিফোন।'

'ডোন্ট ব্রেক মাই হেড, টেল হিম এনিথিং।' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন তিনি। তারপর বেল টিপলেন। ছ ফুট লম্বা পেশোয়ারি বেয়ারা রেডিমেড সালাম মেলে ধরে নরম হয়ে সামনে দাঁড়াল, 'স্যার।' আনোয়ার আজিম সাহেব আরেকটা চুরুট ধরিয়ে বললেন—

'ক্লার্ক রুম সে মুবিনুল ইসলাম সাবকো বোলাও জলদি।'

ভব্যতায় অনভ্যস্ত পেশোয়ারি বেয়ারা ক্লার্ক রুমে গিয়ে চিৎকার করে বলল

'ইয়ে মুবিনুল ইসলাম কিস কা নাম। জলদি আও। বড়া সাব বোলা রহা।'

অন্যান্য কেরানিরা মুখ তুলে তাকাল। কেউ মুখ টিপে হাসলো। নিশ্চয়ই কোন ভুল বেরিয়েছে। ম্যানেজার নালিশ করেছেন। মুবিনুল ইসলামের মুখমণ্ডল মরার মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বোধহয় তার চাকরিটি নেই আর। সহকর্মীদের মুখের দিকে একবার ছলছল চোখে তাকিয়ে কলম হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ড্রয়ার বন্ধ করতেও ভুলে গেল। লম্বা লম্বা চুলে আঙুল চালিয়ে কি একটা ভাবতে চেষ্টা করল। কয়েকটা চুল উপড়ে এল আঙুলের ডগায়। শরীরটা কাঁপছে আশঙ্কায়। প্রাণপণ শক্তিতে কাঁপুনি থামিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কক্ষে ঢুকে সালাম জানাল। অর্ধেক স্বর তার কণ্ঠে আটকে রইল, তারপর খুনি আসামির মত আনোয়ার আজিম সাহেবের দিকে চোখ তুলে তাকাল। ভাসা ভাসা টানা টানা কালো একজোড়া চোখ। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেবকে কপালের দিক থেকে দেখলে মনে হয় বেশ গুরুগম্ভীর সম্ভ্রান্ত একজন মানুষ। মুখের আদলে ভদ্রতা আর হিংস্রতার আশ্চর্য মাখামাখি। দেখে মুবিনের কাঁপুনিও থেমে গেছে। সে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। মুহূর্তগুলো স্নায়ুতে প্রচণ্ড হাতুড়ির মত আছড়ে পড়ছে। কি আছে তার ভাগ্যে জানে না।

হাই পাওয়ারের চশমার লেন্স পরিষ্কার করে তার আপাদমস্তকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মনে মনে বললেন, হ্যাঁ, এই তো সেই লোক, ইয়েস হি ইজ দ্যা ম্যান। কাপড়-চোপড়ে, কথা-বার্তায়, নম্র ব্যবহারে, হরিণের মত চোখের নিরীহ গভীর চাউনিতে কল্পনার সুন্দর শিখা বসন্তের চারাগাছের মুকুলের মত জেগে উঠতে চাইছে। একটা ভুল ভাঙল। এতদিন তিনি ভেবে আসছেন, তাঁর অফিসে ফ্যাক্টরিতে একমাত্র তিনিই কল্পনা শক্তির অধিকারী। পিয়ন হতে ম্যানেজার পর্যন্ত সকলেই এই সম্পদ হতে বঞ্চিত। সকলেই যন্ত্র বয়লার আর স্পিনিং জেনির মত। কেউ কম দামের, কেউ কম গুরুত্বের, কেউ বেশি দামের বেশি গুরুত্বের।

'তোমার নাম মুবিনুল ইসলাম, না।' নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন।

জ্বি। কাঁদো কাঁদো গলায় জবাব দিল সে।

'বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

বসবে যে তেমন সাহস কই। আর ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আদেশ উপেক্ষাও বা করবে কেমন করে? বসতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেদিকে তাকিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেব একটু হাসলেন। কিছু বললেন না; কোনরকমে একখানা গদি আঁটা চেয়ারে শরীরটা তুলে দিল মুবিন। তার বুক দুলছে। সমস্ত ভার পায়ের ওপর। পা দুটো মেলে খুঁটির মত ঠেস দিয়ে রাখল।

চোখ উপরে তুলতে পারছে না। সাময়িকীর গল্পটা দেখিয়ে আনোয়ার আজিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন :

'এটা কি তোমার লেখা?'

নিজের লেখার দিকে তাকাতেই তার কালো চোখের তারায় ঝিকিমিকি শিখা কেঁপে উঠল।

'জ্বি আমারই লেখা।' আমতা আমতা করে বলল। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে লজ্জা মেশালে যেমন হয়, তেমনি ধ্বনিত হল তার কণ্ঠস্বর।

'বেশ ভাল গল্প।' মন্তব্য করলেন আনোয়ার আজিম সাহেব।

মেঘ কেটে সূর্য উঠার মত করে মুবিনের মনটা পরিষ্কার হয়ে গেল। গলির মোড়ের কলে জল পড়ার শব্দে যেমন আচমকা সমুদ্রের কথা স্মরণে আসে, চঞ্চল বালিহাঁসের মত মানস সরোবরের দিকে ধাবিত হয় সমস্ত চেতনা— তেমনি অনুভব করল।

আনোয়ার আজিম সাহেব বেল টিপলেন। বেয়ারা এলে দুকাপ ওভ্যালটিন আনার আদেশ দিলেন। দুমিনিট পরে এসে গেল ধূমায়িত পেয়ালা। মৃদু চুমুক দিয়ে বললেন, 'নাও ওভ্যালটিন খাও।' কাঁপা কাঁপা হাতে পেয়ালাটা তুলে নিতে গিয়ে কিছুটা ছলকে পড়ে তার সার্ট প্যান্ট ভিজিয়ে দিল। আড়চোখে দেখলেন আনোয়ার আজিম সাহেব, কিচ্ছু বললেন না। ওভ্যালটিন শেষ করে চুরুট টানতে টানতে বললেন

'কাল রোববার আছে। সকালবেলা আমার ধানমণ্ডির বাড়িতে এস। গল্প করা যাবে। ঠিকানা লিখে নাও— সতের নম্বর রোডের একশ' পঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়ি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টরের রুম থেকে হাড় কাঁপানো অনুভূতি নিয়ে বেরিয়ে এল মুবিন। তার চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই নতুন। অফিসের ফাইলগুলোকে এতটুকুও বিশ্রী মনে হল না, খিটখিটে মেজাজের বুড়ো অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দেখে তার বুড়ো বাপের মুখের আদল মনে হল। বুলডগের মত অশিষ্ট পেশোয়ারি বেয়ারাটাকেও মনে হল একেবারে ছেলে মানুষ। পৃথিবীতে আনন্দের ঘাটতি নেই। টেবিলের দেরাজে, আলমারির তাকে, পাতলুনের পকেটে এবং মনের চোর কুঠুরিতে লুকিয়ে থাকে জীবনের ঘন গভীর আনন্দ। হঠাৎ কখনো কোন শুভলগ্নে বেরিয়ে মনের সুকোমল বৃত্তিগুলো দুলিয়ে দিয়ে যায়, অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ এবং ঘ্রাণশক্তিকে করে প্রসারিত।

তার পরের দিন খুব সকালবেলা, কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে নিয়ে গায়ে সাবান মেখে ফেনিয়ে ফেনিয়ে গোসল করল। নতুন ব্লেডে দাড়ি কামাল। রুমমেটের ডিবে থেকে স্নো পাউডার নিয়ে সারা মুখে চুনকাম করল। লন্ড্রি থেকে সদ্য আনা পাটভাঙা কাপড়-চোপড় পরে আয়নাতে নিজের মুখ দেখল। মেসে লোকেরা মুবিনের এ পরিবর্তনে তাজ্জব বনে গেল। প্রতিটি

রোববার সে দিনের এগারোটা অবধি ঘুমোয়। ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করে জানালার পাশে তিনটে পর্যন্ত বসে থাকে। আকাশ দেখে। মেসের লোকেরা বলে আসমান আসর করেছে। তোয়াক্কা করে না মুবিন। আজকের সাজসজ্জার বহর দেখে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। হেতু কিছু বুঝল না। দুয়েকজন মন্তব্য করল। কান দিল না মুবিন। নাস্তা না খেয়েই বেরিয়ে এল।

মালীবাগের মোড়ে এসে এক প্যাকেট দামি সিগারেট কিনল। একটা জ্বালিয়ে দীর্ঘ করে টান দিতে থাকে। হাতের ইশারায় একটা স্কুটার থামিয়ে উঠে বসে। ধোঁয়া উড়িয়ে স্কুটার ছুটছে। আবেগে উত্তেজনায় কেমন ফুলে ফুলে উঠছে সারা শরীর। সমস্ত গ্লানি কেটে গেছে জীবনের। এতদিনে বুঝি নাভিমূলে কস্তুরী পুষ্পের কলি ফুটল। পূর্বদিকে চেয়ে দেখে তরুণ সূর্য লাফিয়ে লাফিয়ে উপর দিকে উঠছে! নরম রোদের কুসুম কুসুম ভাপে তার সমস্ত শরীরটা কাঁচা হয়ে উঠেছে। অনুভূতির স্বর্ণতারে কাঁপছে সুর— কাঁপছে গান। হৃদয়টা রক্ত মাংসের বাঁধন কেটে সূর্যমুখীর মত সূর্যের দিকে উন্মুক্ত হয়ে থাকতে চায়।

বেলা নটার সময় মুবিন ইস্টবেঙ্গল সিল্ক ইন্ড্রাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেবের ধানমণ্ডির বাড়িতে এল। লোহার গেট খুলে ভেতরে যেতেই খুঁটির সঙ্গে শেকল বাঁধা একটা লোমশ আলশেসিয়ান কুকুর বাঘের মত চিৎকার করে। থমকে দাঁড়ায় মুবিন। ইজি চেয়ারের উপর বসে আছেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর সাহেব। পাশে ছোট একটা টেবিল। তাতে চুরুটের বাক্স। তিনি বসে বসে কাগজ পড়ছিলেন। আর চুরুট টানছিলেন। পাটভাঙা ধবধবে পাজামা পাঞ্জাবি তাঁর পরনে। তাতে করে তাঁর চেহারার আরো খোলতাই হয়েছে। তাঁকে এমন ঘরোয়া পরিবেশে আর কোনদিন দেখেনি। হাত দিয়ে ইশারা করলে এগিয়ে গেল। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করলেন

'তা হলে তুমি এলে?'

'জ্বি।' মৃদু হেসে জবাব দিল মুবিন।

'বস, আমার বাতের শরীর কিনা, নড়াচড়া করতে পারিনে। ওরে হাবিব একখানা চেয়ার দিয়ে যা।'

মুবিন কম তাজ্জব হল না। যে লোকটির ঠাণ্ডা দৃষ্টির সামনে অফিসের দারোয়ান থেকে ম্যানেজার পর্যন্ত হিমশিম খেয়ে যায়— তার শরীরেও নামে বাতের ব্যথা, যার ইঙ্গিতে ইস্টবেঙ্গল সিল্ক ইন্ড্রাস্ট্রিজের দৈত্যের শরীরের মত ভারি যন্ত্রপাতি চব্বিশটা ঘণ্টা ঘটাং ঘটাং কাজ করে যায়, তার মত মানুষও বাতের মত তুচ্ছ রোগের শিকার হয়— এ কেমন করে সম্ভব?

চেয়ারে সসঙ্কোচে বসে রইল মুবিন। হাত পা নাড়তে সাহস পেল না। পাছে বেয়াদবি হয়ে যায়! চুরুটে টান দিয়ে খক খক করে কাশলেন আনোয়ার আজিম সাহেব।

'নাস্তা তো করনি। ওরে হাবিব, সাহেবকে নাস্তা দিয়ে যা।'

মুবিন নাস্তা করতে আসেনি। তিনি যে দয়া করে আসতে বলেছেন এইই যথেষ্ট। এত বড় বাড়িতে, এতবড় একজন মানুষের সামনে বসে নাস্তা খেতে গিয়ে যদি খারাপ কিছু করে বসে? যদি তার স্বভাবের কোন খুঁত বেরিয়ে পড়ে! এতবড় একজন মানুষের হুকুম নাইবা করবে কেমন করে?

নাস্তা এল। কলা, পেস্ট্রি, মাখন, মামলেট, জেলি। ট্রেতে থরে থরে সাজানো। খাওয়ার চেয়ে তাকিয়ে থাকতেই অধিক আনন্দ। মেসের বারোয়ারী বাবুর্চির হাতে বানানো তক্তার মত শক্ত পরোটা আর সুজি গোলা হালুয়া দিয়ে প্রত্যেকদিন সকালবেলার তীক্ষ্ণ ক্ষুধাকে হত্যা করেছে সে। প্রথমে হাত উঠছিল না। তার বিব্রত ভাবটা বুঝতে পারলেন আজিম সাহেব। হা হা করে উঠলেন

'খাও নাস্তা খাও,' তারপরে কথা বলব।

'আপনি?'

'আমার কথা বলছ? আমার কি আর ওসব গুরুপাক জিনিস খাওয়ার দিন আছে। এককালে খেতে পারতাম। এখন সামান্য ফলমূল, এই আহার, এই খাবার।'

খাওয়া হয়ে গেলে চাকর দুকাপ চা রেখে গেল। এক কাপ চা টেনে নিয়ে মুখে ঠেকিয়ে বললেন আনোয়ার আজিম সাহেব :

গতকাল তোমার লেখাটা পড়ে একটু চিন্তা করেছি। মুবিন অপলক চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। একটু থামলেন। গলার স্বরটা নামিয়ে এনে বললেন :

'তোমার মত ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসের কাজ কেরানিগিরি নয়। ইচ্ছে করলে অনেক ভাল কাজ তুমি করতে পার।'

মুবিনের বুকের ভেতর মাদল বেজে চলেছে। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে চোখের সবটুকু দৃষ্টি মেলে। জীবনের সৌভাগ্যের সিঁড়ি যেন তাঁর মুখের কথায় তরতর করে নেমে আসছে। তিনি বলে যেতে লাগলেন :

'এককালে আমিও 'কালচারের' ভক্ত ছিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম বেঙ্গলি লিটারেচারে হাইয়েস্ট মার্ক পেয়েছিলাম। ইচ্ছে ছিল কিছু লিখব। টাইমের অভাবে হয়ে উঠল না। তোমার লেখাটি পড়েছি। 'লাভলি'। দেখার চোখ আছে, অনুভব করার মন আর বলবার ভাষা সবই আছে। সেই মাস্টারটিকে একেবারে 'হিরো' বানিয়ে দিয়েছ। আমি বলি তোমার 'গড গিফটেড ট্যালেন্টকে' ভাল কাজে লাগাও। মাস্টার ফাস্টার ইত্যাদির কিইবা আছে, এমন জীবন পুঁটি মাছের প্রাণ। একটু বুদ্ধি খরচ কর। টাকার অভাব হবে না, পরিবারে সাফারিং থাকবে না, দেশের সেবা হবে, সাহিত্যও হবে তোমার 'রিচ'। যেমন ধর আমাকে নিয়েই লেখ না একটি বই। পাঁচশ পাতা, হাজার পাতা, দেড় হাজার পাতার হোক না ভয় কিসের? ছাপবো

তো আমি। লেখক হিসেবে নাম থাকবে তোমার। কি না করেছি আমি। মাত্র এক হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে লাইফে স্ট্রাগল করতে নেমেছি। কি না করেছি। চার-চারটে ইন্ড্রাস্ট্রি গড়েছি। একখানা ব্যাংকের জন্ম দিয়েছি। পশ্চিমাদের কথা বাদ দিলে বাঙালিদের মধ্যে আমিই সেকেন্ড বিগ ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট। সব করেছি— মাত্র দুখানা হাত আর এই মাথাটা দিয়ে।' মাথার কাঁচা-পাকা চুলে তিনি হাত ঠেকালেন। নিভে যাওয়া চুরুটে অগ্নি সংযোগ করে বলে যেতে লাগলেন।

'দান ধর্ম কি কম করেছি? মার নামে এতিমখানা করেছি, দুখানা পাকা মসজিদ দিয়েছি, আব্বার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছি। গ্র্যান্ড ফাদারের নামে কলেজ গড়েছি। নিজের নামে ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ ডিক্লেয়ার করেছি। স্ত্রীর নামে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, আই মিন সমাজকল্যাণ ফান্ড খুলেছি। ফি বছর হাজার দশেক টাকা খরচ হয়। চারটে ইন্ড্রাস্ট্রি গড়ে চার চারটি হাজার মানুষের ডাল ভাতের পথ খুলে দিয়েছি। এ সমস্তের উল্লেখ করে সুন্দর সুন্দর ঘটনা কল্পনা করে গেঁথে দিয়ো। সময়ের জন্য ভাবছ? একটুও ঝামেলা নেই তোমার। কোন 'ট্রাবল' হতে দেব না। এখন কত পাচ্ছ? একশ' ষাট, না? মাসে তোমাকে এইট হান্ড্রেড করে দেব। ওকি, হোয়াই ইউ আর সো গ্লুমি। কি ভাবছ? লেখার জন্য সাইলেন্ট অ্যান্ড সোলিটারি প্লেসের কথা? আমার গুলশানের বাড়িখানা তো খালিই পড়ে রয়েছে। সেখানে চলে এস না কেন? উইকলি, ফোর্টনাইটলি এক আধবার আমি গিয়ে রিজয়স করি মাত্র। একা থাক, চিন্তা কর আর লিখে যাও। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এক-আধটু আমোদ ফুর্তি তা করবে বৈকি। মাইন্ড ফ্রেশ না থাকলে লেখার কাজ হয় না। কলকাতার অনেক লেখক আমার ফ্রেন্ড ছিলেন। সব দেখেছি। এক গ্রোস হোয়াইট হর্স সে বাড়িতেই কেনা আছে। যখন ইচ্ছে ঢেলে একটু গলায় দাও। আর লিখে যাও— কি বল, রাজি?'

'স্যার লেখার জন্য প্রয়োজন চেনাজানা আর নিবিড় পরিচয়।' সাহস করে বলল মুবিন।

হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ। সে ব্যবস্থাও আমি করে দিচ্ছি। যাও, দেশের বাড়িতে যাও— দেখে এস আমার বাড়িঘর। দেখে এস কত হাম্বল বিগিনিং আমার। কি ছিলাম, কি হয়েছি। লোকের কাছে জিজ্ঞেস কর। অত বেশি ঘাঁটতে হবে না, শার্প ব্রেন তোমার সব বুঝে নিতে পারবে। আমার স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা আর হাসপাতাল সব ঘুরে ঘুরে দেখ। মিল ফ্যাক্টরি ভিজিট করে দেখ কত লোক খাটছে। তখন আমার সম্বন্ধে তোমার আইডিয়া পাল্টে যাবে। সব দেখে শুনে কল্পনা করে লিখে ফেল বড়সড়, শেষ করতে দুদিন লেগে যায়, এরকম একখানা বই। ইন্টারেস্টিং করে লিখবে যাতে লোকে পড়ে আনন্দ পায় আর কিছু শিখতে পারে। গ্রেট ম্যানদের লাইফ পড়েই তো সাধারণ মানুষ ইনস্পায়ার্ড হয়— কি বল? তোমার লেখা পড়ে লোকে

আমার ভেতরকার বীর পুরুষটিকে চিনবে আর তোমাকে চিনবে আমার জীবনী লেখক হিসেবে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'এ হল এক ধরনের কো-অপারেশন।'

ইস্টবেঙ্গল সিল্ক মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেবের প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি জানিয়ে চলে এল মুবিন। দুমাসের মাইনে ষোল শ' টাকা অগ্রিম দিয়েছেন! এছাড়া সবকিছু ঘুরে দেখার জন্য আলাদা টাকা দিলেন। সেদিনই সন্ধেবেলা গুলশানের বাড়িতে শিফট করল মুবিন।

কদিন গুলশানের বাড়িতে বেশ আরামসে কাটিয়ে দেখাশোনার কাজে বেরিয়ে পড়ল। প্রায় পনের দিন যাবত ঘুরে ঘুরে দেশের বাড়ির স্কুল, কলেজ, এতিমখানা, দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি দেখে এল।

মজা করে বেশ কদিন ঘুমিয়ে কাটাল। মনে মনে লেখাটা শুরু করার চিন্তা। কোন কূলকিনারা করতে পারে না। কলম রেসের ঘোড়ার মত নেচে নেচে সামনের দিকে এগিয়ে যায় না! এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেও কিছু হয় না। পড়ে থাকে লেখার কাজ। তার সৃষ্টি ক্ষমতা যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ছুরি বসিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় বুকে। দিনে দিনে তার অস্তিত্বের সারবান অংশ যেন পচে যাচ্ছে। লেখার নামে কল্পনা ফণা মেলে না, একটু নির্জনতা একটু অবসরের কতই না কাঙাল ছিল এই কিছুদিন আগেও। মনের সমস্ত রং ঢেলে দিয়ে একটি কাহিনীকে রাঙিয়ে তোলার সুঠাম বিশ্বাস কি হাওয়া হয়ে উড়ে গেল? তাহলে কোন সাহসে আকাশে রং বদলে দেবার বাসনা পোষণ করে এসেছে এতকাল?

রোববার দিন সন্ধেবেলা আনোয়ার আজিম সাহেব আসেন। বেশি চাপাচাপি করেন না। লেখকদের সম্পর্কে অল্পস্বল্প জানেন। মুড এলে কলম আপনিই ছুটবে। মুবিনকেও তিনি মনে করেন যন্ত্র— লেখার যন্ত্র। তবে ম্যানেজার আর অ্যাকাউন্ট্যান্টের মত নয়। বড় ডেলিকেট আর সাসসেপটিবল। মৃদু তাগাদা দিয়ে বলেন

'কতদূর তোমার কাজ। এরি মধ্যে শিল্পপতি নছর আলী খাঁর জীবনী বেরিয়ে গেছে। লোকে প্রশংসা করছে। তোমার কাজও শেষ করে ফেল। বলা তো যায় না, কখন মারা যাব। এই তো এই অফিসেই হার্টফেল করে আমার এক ফ্রেন্ড মারা গেল। মরলে তো ছেলেমেয়েরা নিশ্বাসও ফেলবে না। দে আর ইন্টারেস্টেড ইন আদার থিংস দ্যান অব দেয়ার ফাদার। শত্রুতার তো অভাব নেই, তারা নানা কথা রটাতে পারে। তোমার সুন্দর কল্পনা আছে, কিছুটা ভাল ভাল কথা জুড়ে দিয়ো, যেমন কবিতা লিখতে পারি, ছবি আঁকতে পারি। সেসবেরও অর্ডার দেব। তুমি যোগ করে দিয়ো মূল বইতে। জানো তো কবি শিল্পীদের প্রতি মানুষের সাধারণ দুর্বলতা।

তারপর গেলাসে মদ ঢালেন, নিজে খান মুবিনকে খাওয়ান। মাত্র মাস খানেকের মধ্যে মুবিন মদখোর হয়ে উঠেছে। আনোয়ার আজিম সাহেব চলে গেলেও সে আধারাত অবধি মদ খায়। নেশার ঘোরে চিৎ হয়ে ঘুমোয়। তারপরে শহরে বের হয়। শহর থেকে আসে সন্ধেবেলা। মাঝে মাঝে ভাড়া করা মেয়েমানুষ নিয়ে যায়। মদ আর মেয়েমানুষে সারারাত গুলজার করে। এক একদিন গত হয়। যেমনকার তেমন পড়ে থাকে লেখার কাজ।

রোববার দিন সন্ধেবেলা আসেন আনোয়ার আজিম সাহেব। চশমার লেন্সের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে প্রশ্নবোধক চিহ্নের মত। প্রখর দৃষ্টি যার একমাত্র মানে কতদূর তোমার। মুবিন নানা তালবাহানা করে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে। তবু সে কঠিন দৃষ্টির শর থেকে যেন তার মুক্তি নেই। মনে মনে হাঁসফাঁস করে। একসঙ্গে মদ খায়। দুয়েক পেগ পান করেই আনোয়ার আজিম কেমন কাঠের মত শক্ত হয়ে যান, যতই পান করেন, ততবেশি গম্ভীর হয়ে ওঠেন। তীক্ষ্নতর হয়ে ওঠে দৃষ্টি, ছুরির ফলার মত। মুবিন ভয় করে আনোয়ার আজিম সাহেবের তীক্ষ্ন দৃষ্টি! ইতোমধ্যে ঘৃণা করতে শুরু করেছে। অল্প একটু খেলেই মাতাল হয়ে নানারকম বেফাঁস কথা বলে। জীবনে লোক চিনতে ভুল করেননি কখনো, এবার কি ভুল হয়ে গেল তাঁর?

মুবিন যতই লিখতে চেষ্টা করে, আনোয়ার আজিম সাহেবের ভাবলেশহীন মুখ এবং কড়া দৃষ্টির তীক্ষ্ন চোখজোড়া ততই তার সামনে জেগে ওঠে। অমনি ঘৃণায় সারা মন বিষিয়ে যায়। লেখার মত কি আছে লোকটার জীবনে? আবর্জনা, সব আবর্জনা। তাঁর জীবনের আগাগোড়া তন্ন তন্ন খোঁজাখুঁজি করেও এমন একটি স্ফুলিঙ্গের দেখা পেল না, যার স্পর্শে মনের সমস্ত কল্পনা কৃষ্ণচূড়ার মত বর্ণময় হয়ে ওঠে, পঙ্খীরাজ ঘোড়ার মত উড়ে চলে কলম! বুকের ভেতর ঝড়ের মত গর্জন বাজে। কলমটা ফেলে রেখে সে হাঁফায়। অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়। তারপর আবার মদ নিয়ে বসে।

এমনি একদিন প্রচণ্ডভাবে লিখতে চেষ্টা করে বিফল হল। একটা পঙক্তিও বের হল না। তখন গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল তার। মনে হল সে কোনদিন আর লিখতে পারবে না, বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেও না। ভারি দুঃখ হয়, কেন সে রাজি হল। পয়সার লোভে সে তার অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠ অংশকেই হত্যা করে ফেলল। যে লোকটা পয়সা দিয়ে তার কল্পনার দিগন্ত এমন সঙ্কুচিত করে ফেলছে, তাকে খুন করলেও গায়ের জ্বালা মিটবে না। কি করবে সে। হঠাৎ মনে হল এ বিশাল পৃথিবীতে সে একা, তাকে ঘিরে হাহাকার করছে এক বিরাট শূন্যতা।

সেদিনই সন্ধেবেলা এলেন আনোয়ার আজিম সাহেব। দেখাও দেখি কতদূর হয়েছে।

হঠাৎ যেন মুবিনের অবচেতন মনের সমস্ত ক্ষোভ, সমস্ত জ্বালা নেশার ঘোরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। রক্তজবার মত লাল ফোলা ফোলা দুচোখ মেলে সে বলে যেতে লাগল :

'তোমার একখানা জীবন— তার আবার জীবনী! নোংরামি, বদমায়েসি শোষণের ডিপো। ওর নাম জীবন। ওতে কি আছে লেখার। ওহ্ কাছে এস না, গন্ধ লাগে, পায়খানার গন্ধ। আমি কেন তোমার ফাঁদে পড়লাম, কেন তোমার টাকা নিলাম। কেন তোমার ঘরে এলাম। আমার চরিত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখন আমার কি হবে!' ছেলেমানুষের মত ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলে মুবিন।

একটু পরে আবার হা হা করে হাসতে থাকে, 'টাকা নিয়েছি, বেশ করেছি, তোমার লুটের টাকায় ভাগ বসিয়েছি। বুদ্ধিমানের কাজ করেছি! তোমার জীবনের ময়লা ঘেঁটে ডান হাত আমি ময়লা করতে পারব না, মরে গেলেও না। ওকি, মুখ কালো করলে কেন। যা ইচ্ছে কর। ভাল লাগলে পা ছড়িয়ে কাঁদো। মুবিনুল ইসলাম তোমার জীবনী লিখবে না।'

আনোয়ার আজিম সাহেবের মুখমণ্ডল আগুনের তাওয়ার মত লাল হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে ধরে অস্ফুটে বললেন :

'আনগ্রেটফুল ক্রিয়েচার, তোর ডান হাতটাই আমি কেটে নেব।'

টেলিফোনে ডায়াল করে কাকে ডাকলেন। 'হ্যালো মালু আছে নাকি?

আমি তোদের সাহেব গুলশানের বাড়ি থেকে কথা বলছি।

শোন, একটা ছোট কাজ করতে হবে। হাফিজকে নিয়ে চলে আয়।

না, পিস্তল না, একখানা ধারালো ছুরি আনবি শুধু একটু ভারি দেখে।'

এইসব কাজের জন্যে মালুকে মাসিক ভাতা দিয়ে পুষছেন আনোয়ার আজিম সাহেব। মিলেটিলে শ্রমিকরা গোলমাল করলে কাজে লাগে।

একটু পরেই একজন সঙ্গী নিয়ে এল মালু। আনোয়ার আজিম সাহেব মুবিনকে দেখিয়ে বললেন, 'গাড়িতে করে এই কুকুরটাকে মহাখালীর ওদিকে নিয়ে গিয়ে ডান হাতটা কেটে আমাকে এনে দিবি। এর দাম চার হাজার টাকা।'

মালুমিয়া মুবিনকে এসে ধাক্কা দিয়ে বলল

'এই— গাড়িতে ওঠ।'

নেশায় চুর মুবিন। জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে

'কোথায়?'

'শ্বশুর বাড়িতে।'

'না, যাব না।'

'শালা রংবাজি রাখ।'

মালু মিয়ার এক ধাক্কায় গাড়িতে উঠে বসে মুবিন।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করে। নেশায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে মুবিন। গুলশানের ওপাশে গাছপালা যেখানে কালো কালো ছায়া ফেলেছে সেখানে গাড়ি

থামিয়ে ধরাধরি করে তাকে নামাল ওরা। ধারালো ছুরির এক আঘাতে ডান হাতখানা কেটে নিল। 'মাগো' বলে বুকভাঙা চিৎকার করে উঠল মুবিন। চার হাজার টাকা দামের কাটা হাতখানা নিয়ে ওরা গাড়ি চালিয়ে চলে এল।

তিনমাস পর। 'সংরাগে'র আরেকখানা কপি নিয়ে মুবিন ইস্টবেঙ্গল সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজের অফিসে এল। বারান্দা দিয়ে হেঁটে সোজাসুজি ডিরেক্টর আনোয়ার আজিম সাহেবের চেম্বারের দোর গোড়ায় এল সে। বেয়ারাটি নেই। সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল। তাকে দেখে ভীষণভাবে চমকে উঠলেন আনোয়ার আজিম।

'তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি।'

হাত দিয়ে কাগজখানার পাতা উল্টে সামনে রাখল মুবিন!

আনোয়ার আজিম তাকিয়ে দেখেন মুবিনুল ইসলামের লেখা।

'আবার লিখেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, এবার বাম হাত দিয়ে। লিখেছি তোমার জীবনের অসারতার কথা, ভণ্ডামির কথা। আর লিখেছি বাম হাত দিয়ে ডান হাত হারানোর কাহিনী।

আনোয়ার আজিম সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন। ক্রুর মুখে একটা ক্ষীণ শ্লেষের হাসি ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে গেল।

'যদি তোমার বাম হাতটাও নিই?'

'তা তুমি পারবে না।' জ্বালাময় তীক্ষ্ণ চোখে আনোয়ার আজিমের মুখের ওপর প্রায় ঝলসে ওঠে মুবিন। চার হাজার টাকার বিনিময়ে ডান হাতটা খেসারত দিয়েছি; কিন্তু বাম হাত আমার।

উত্তেজনার প্রাবল্যে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল সিল্ক ইন্ডাস্ট্রিজের জাঁদরেল ডিরেক্টর আনোয়ার আজিমের। মুবিনের বেপরোয়া মুখের দিকে তাকিয়ে আজ হঠাৎ তিনি অনুভব করলেন যেন জোড়ায় জোড়ায় তার সমস্ত শরীর খুলে যাচ্ছে, শ্লথ শিথিল হয়ে যাচ্ছে তার সমস্ত জীবনের গৌরব, যেন আবর্জনার সঙ্গে ক্রামগত মিশে যাচ্ছেন তিনি।